শুকতারা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা
আষাঢ় • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

কিন্তু আততায়ী ঝাঁপিয়ে পড়তেই অভিযাত্রী মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রচণ্ড লাথি বসিয়ে দিলো তার মুখে।

যাক্, বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই থাকো!

কালে কালে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ী। রাজসূয় যজ্ঞ করছেন যুধিষ্ঠির। সবাই এসেছেন। এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর খাতির দেখে চেদিরাজ শিশুপাল ক্ষিপ্ত। কৃষ্ণকে অপমান করতে লাগলেন তিনি।

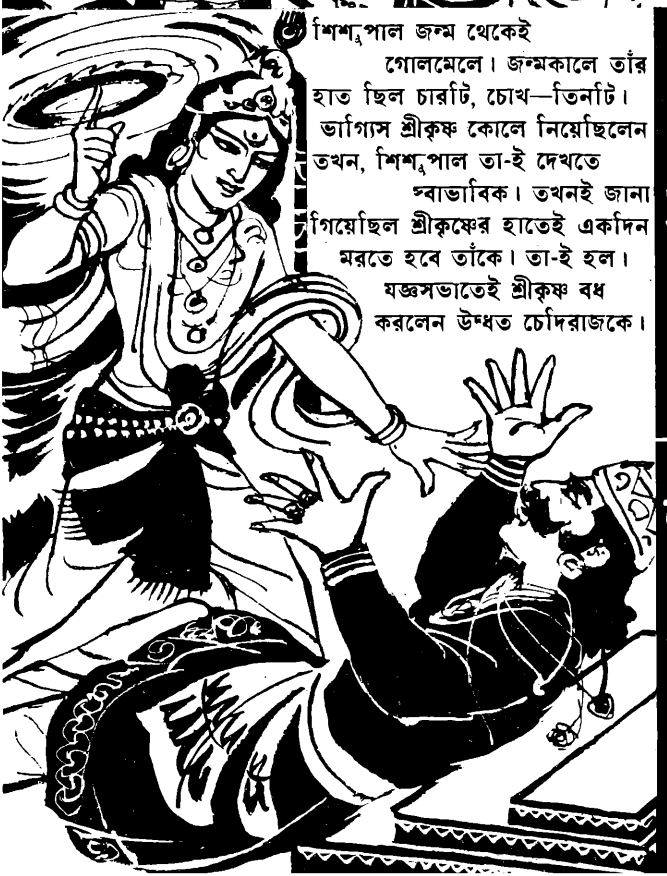

শিশুপাল জন্ম থেকেই গোলমেলে। জন্মকালে তাঁর হাত ছিল চারটি, চোখ—তিনটি। ভাগ্যিস শ্রীকৃষ্ণ কোলে নিয়েছিলেন তখন, শিশুপাল তা-ই দেখতে স্বাভাবিক। তখনই জানা গিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের হাতেই একদিন মরতে হবে তাঁকে। তা-ই হল। যজ্ঞসভাতেই শ্রীকৃষ্ণ বধ করলেন উদ্ধত চেদিরাজকে।

অমৃতসমান মহাভারত-কথা

বোরোলীন
হাউস কর্তৃক প্রচারিত

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক,
কিংবা ঝলসানো ত্বকের
অমবদ্য নিরাময়—।

(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

মাছ ধরার পরে আজলের দিলটা খুব চমৎকার বাঁটুলদা! আজ ইস্কুলে যাবো কি না ভাবছি!
হুঁ! আজ স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার মতলব
ছিপগুলোকে আলমারির ওপর লুকিয়ে রাখি!
চটপট তৈরি হয়ে নে! আর এই নে মুখে লাগাবার নতুন একটা সুগন্ধী ক্রীম!
আচ্ছা বাঁটুলদা!
কিছুক্ষণের মধ্যেই
বাঁটুল! ওই বিচ্ছু দুটো আজ স্কুলে যায় নি!
কী!
ছিপগুলোও নেই, আর জানলাটাও খোলা দেখছি!
আহা! এখানে আমি ওদের গন্ধ পাচ্ছি! মনে হয় আমি ওদের ঠিক খুঁজে বের করতে পারবো!
উঁস! উঁস!
হ্যাঁ! এখানেও ওদের ক্রীমের গন্ধ পাচ্ছি! ওরা এই বাগান দিয়ে বেরিয়ে গেছে
গন্ধটা ক্রমশঃ বেশ জোরদার হয়ে উঠছে!
দ্যাখ, বাঁটলো ব্লাডহাউণ্ডের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমাদের ধরতে আসছে মাইরি!
স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাছ ধরা? ছিপ এখানে ফেলে চল—তোদের স্কুলে রেখে আসি!

আষাঢ়—

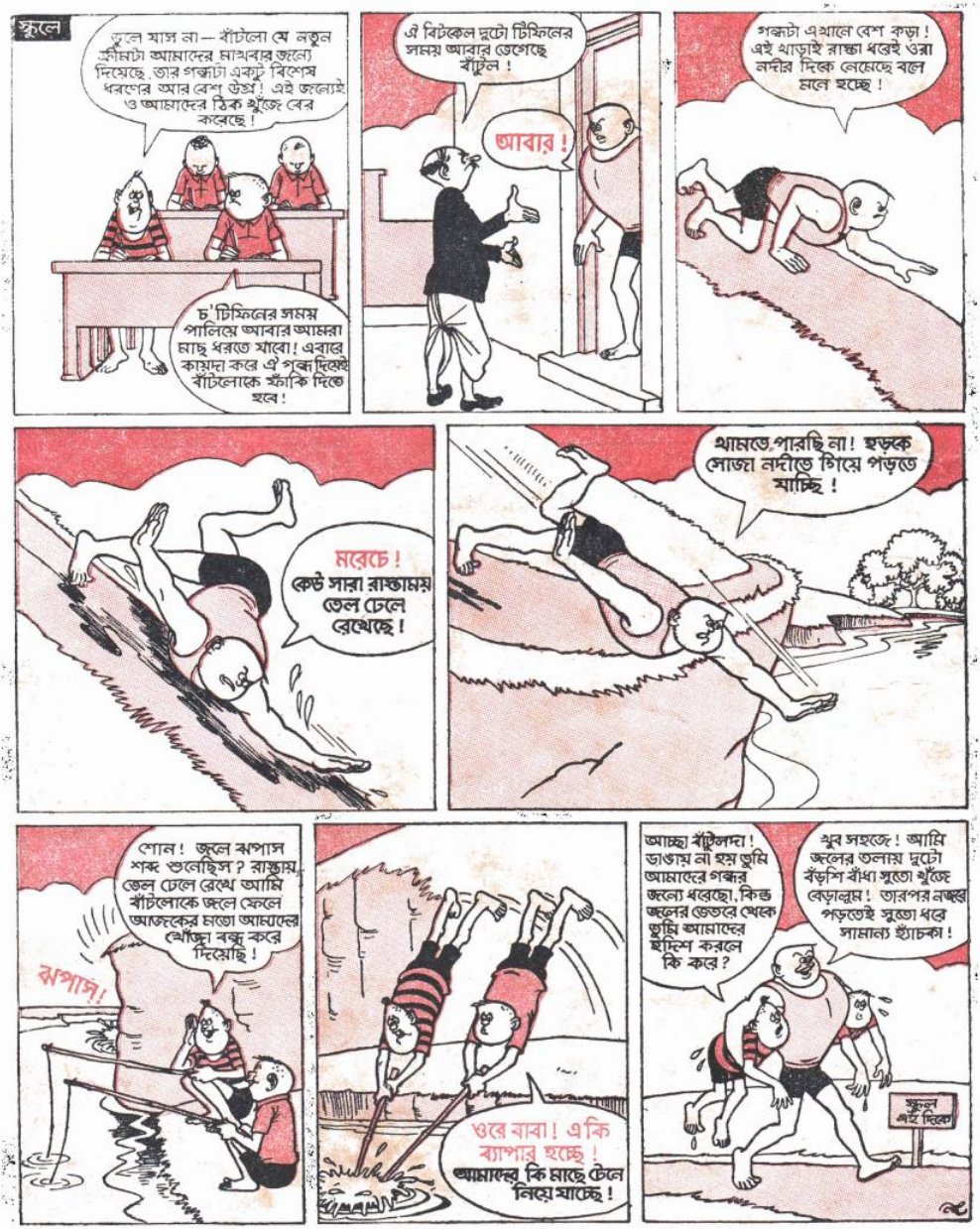

স্কুলে
ভুলে যাস না — বাঁটলো যে নতুন ক্রীমটা আমাদের মাখবার জন্যে দিয়েছে, তার গন্ধটা একটু বিশেষ ধরণের আর বেশ উগ্র! এই জন্যেই ও আমাদের ঠিক খুঁজে বের করেছে!
চ' টিফিনের সময় পালিয়ে আবার আমরা মাছ ধরতে যাবো! এবারে কায়দা করে ঐ গন্ধ দিয়েই বাঁটলোকে ফাঁকি দিতে হবে!
ঐ বিটকেল দুটো টিফিনের সময় আবার ভেগেছে বাঁটুল!
আবার!
গন্ধটা এখানে বেশ কড়া! এই খাড়াই রাস্তা ধরেই ওরা নদীর দিকে নেমেছে বলে মনে হচ্ছে!
মরেচে!
কেউ সারা রাস্তাময় তেল ঢেলে রেখেছে!
থামতে পারছি না! হড়কে সোজা নদীতে গিয়ে পড়তে যাচ্ছি!
শোন! জলে ঝপাস শব্দ শুনেছিস? রাস্তায় তেল ঢেলে রেখে আমি বাঁটলোকে জলে ফেলে আজকের মতো আমাদের খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছি!
ঝপাস!
ওরে বাবা! একি ব্যাপার হচ্ছে!
আমাদের কি মাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!
আচ্ছা বাঁটুলদা! ডাঙায় না হয় তুমি আমাদের গন্ধর জন্যে ধরেছো, কিন্তু জলের ভেতরে থেকে তুমি আমাদের হদিশ করলে কি করে?
খুব সহজে! আমি জলের তলায় দুটো বঁড়শি বাঁধা সুতো খুঁজে বেড়ালুম! তারপর নজরে পড়তেই সুতো ধরে সামান্য হ্যাঁচকা!
স্কুল এই দিকে

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	সাহসী (কবিতা) ...	শ্রীঅশোক সী ...	৩১১
৪।	খোঁজাখুঁজি খেলা (মজার ছবি) ...	— ...	৩১২
৫।	বিরাট একটি ডিম (বিদেশী উপকথা) ...	অনিমা দে ...	৩১৩
৬।	মজার প্রশ্ন (মজার ছবি) ...	— ...	৩১৮
৭।	ফাঁসির পরে অট্টহাসি (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৩১৯
৮।	৩১২ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	৩২৭
৯।	সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প) ...	দিলীপ দাস ...	৩২৮
১০।	অমূল্য দান (জীবন কথা) ...	শৈলেশ ভড় ...	৩৩০
১১।	৩১৮ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	৩৩৪
১২।	রেডিওর আদি আবিষ্কারক সেই পাগলটা (জীবন কথা) ...	অদ্রীশ বর্ধন ...	৩৩৫
১৩।	আশ্চর্যের কথা (জানবার কথা) ...	— ...	৩৩৮
১৪।	শেষ মৌর্য শতংধনুঃ (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৩৩৯
১৫।	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক ...	৩৪৯
১৬।	জাবালুজা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৩৫৫
১৭।	"৺মৌঝুরি স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	— ...	৩৬৩
১৮।	হাঁদা-ভোঁদার দড়ির ফাঁস (ছবিতে গল্প) ...	— ...	৩৬৪
১৯।	অপরাধীর পুরস্কার (গল্প) ...	মদনমোহন রায় ...	৩৬৬
২০।	বাতাসের চেয়ে হালকা বেলুন (জানবার কথা)	— ...	৩৬৮
২১।	কাপুরুষতার ফল (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	এম. আব্দুল ...	৩৬৯
২২।	অভিমানী ভুলি (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)...	চিন্ময় গুহ ...	৩৭২
২৩।	বিজ্ঞানের টানে (জানবার কথা) ...	— ...	৩৭৪
২৪।	ডামপিটে ভগবান (পৌরাণিক গল্প) ...	নটরাজন ...	৩৭৫
২৫।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৩৮২
২৬।	কে আমেরিকা আবিষ্কার করে ? (জানবার কথা)	— ...	৩৮৩

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত।

মূল্য ৮০ পয়সা

everest/551b/PP bn

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা : ১৩৮০, আষাঢ়

সাহসী

শ্রীঅশোক সী

বাঘটা যখন ডাকলে, 'হালুম!'
ছড়িয়ে আগুন চক্ষেতে
একটুও ভয় জাগলো না হে
তখন আমার বক্ষেতে।
কাঁপলো না মোর চোখের পাতা
নাভিশ্বাসও উঠলো না
ভিরমি লেগে আছড়ে পড়ে
দাঁতগুলিও টুটলো না।
চমকালো না পেটের পিলে
বাঘের ভয়াল হুংকারে,

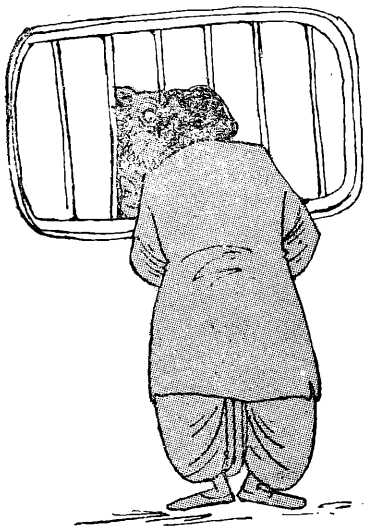

দাঁড়িয়েছিনু সহজ ভাবে
করেই না কেন শঙ্কারে।
বাঘটা তখন হাঁ করেছে
দাপিয়ে বেড়ায় নখ ঠুকে,
আমি তখন তারই ছবি
আঁকছি আমার 'নোট বুকে'।
এমনি আমার সাহস দেখে
হচ্ছ অবাক্ বিস্ময়ে,
বলছি শোনো চুপি চুপি
নয় তো মিছে দৃশ্য এ'।

চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম
তাই মনে ভয় নাহি রে,
বাঘটা ছিল খাঁচার মাঝে—
আমি ছিলাম বাহিরে!

● খোঁজাখুজি খেলা

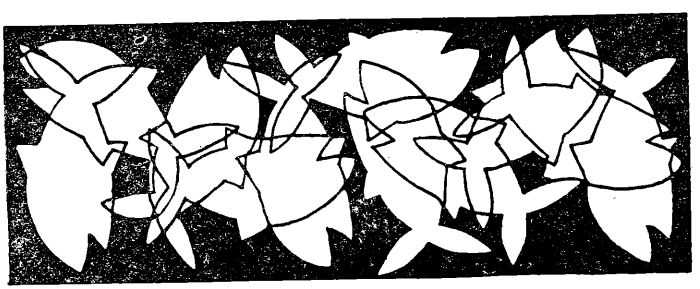

খুঁজে দেখো তো এখানে কটা মাছের ছবি আছে।

না পার তো ৩২৭ পৃষ্ঠায় দেখ।

অণিমা দে

রানীর ছেলে হবে। অন্দরমহল থেকে কি খবর আসে তারই আশায় রাজসভায় বসে অপেক্ষা করছেন রাজা আর তাঁর পারিষদবর্গ। রাজসভা থেকে রানীর শোবার ঘর পর্যন্ত একটি সোনার ও একটি রূপার শিকল চলে গেছে। শিকল দুটো রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। এই শিকলের যে কোন একটি যখন জোরে জোরে নড়ে উঠবে, তখনই সবাই বুঝতে পারবে, রানীর ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে।

সোনার শিকল নড়ে উঠলে বুঝতে হবে ছেলে হয়েছে। আর রূপার শিকল নড়ে উঠলে বুঝতে হবে মেয়ে হয়েছে। রাজা আর তার পারিষদবর্গ শিকল দুটোর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। এমন সময় হঠাৎ একই সঙ্গে দুটো শিকলই নড়ে উঠলো। প্রথমে সবাই হকচকিয়ে গেল। এ কি হলো, দুটো শিকলই সমানভাবে নড়ছে কেন? একটু পরে রাজপারিষদগণ বলে উঠলো, নিশ্চয়ই রাজার জমজ ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাই দুটো শিকলই একসঙ্গে নড়ে উঠেছে। রাজার জমজ ছেলেমেয়ে হয়েছে ভেবে সকলেই খুব খুশী। তারা রাজাকে অভিনন্দন জানালো। কিন্তু খানিক পরেই এক পরিচারিকা এসে হাজির হলো রাজসভায়। সে সবিস্তারে বর্ণনা করে বললো—রানীমা একটি বিরাট ডিম প্রসব করেছেন। ছেলে হয়েছে, না মেয়ে হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাই বিষম সমস্যায় পড়ে গিয়ে রানীর ঘর থেকে একসঙ্গে দুটো শিকলই জোরে নাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই সংবাদে রাজা খুবই বিষাদগ্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করা হলো—এই মুহূর্তে ডিমটি নদীতে নিক্ষেপ করা হোক। আর রানীর মাথাটি মুণ্ডিত

করে, রাজবাড়ির ফুলবাগানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, সেখানে সে প্রধান মালীর সহকারী হিসাবে কাজ করবে।

রাজার আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হলো।

এদিকে ডিমটি নদীতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকলো এক রাক্ষসীর বাড়ির সামনে।

এই রাক্ষসী এক বুড়ীর বেশ ধরে থাকতো। সে তার বাড়ি থেকে দেখলো—নদীর জলে বেশ বড় একটি ডিম ভেসে যাচ্ছে। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, বুড়ী তক্ষুণি সাঁতরে গিয়ে ধরে ফেললো সেই বিরাট ডিমটি। পরে খাবে বলে রান্নাঘরে রেখে দিতে যাচ্ছে ডিমটি, আর হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে গেল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক সুন্দর রাজকুমার।

রাক্ষসী তাকে তক্ষুণি খেয়ে না ফেলে, নিজের ছেলের মত করে মানুষ করতে লাগলো। রাজকুমারও রাক্ষসীকে নিজের মা ভেবে খুব ভালবাসতে লাগলো। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে রাক্ষস-রাক্ষসীদের সভা বসার সময় হয়ে এলো।

এক গভীর বনে মাঝে মাঝে রাক্ষস-রাক্ষসীদের সভা হয়। সেই সভার নিয়ম হলো, যত রাক্ষস-রাক্ষসী আছে সবাইকে এসে হাজির হতে হবে। সবাই একসঙ্গে মিলে ভোজ খাবে। তারপর যে যার বাড়ি চলে যাবে। এই রকম এক সভার দিন ঘনিয়ে এলো। এই রাক্ষসীকেও সেখানে যেতে হবে। তাই সে রাজকুমারকে ভাল করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে রাখছে—দেখ বাপু, এক বিশেষ কাজে আমাকে বাইরে যেতে হবে। তুমি কিন্তু বাড়িতে লক্ষ্মীছেলে হয়ে থেকো। ঘরের বাইরে কোথাও যেও না। ঐ যে গম্বুজটি দেখছো ঐখানে কখনও উঠতে চেষ্টা করো না। কারণ হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকলে কে দেখবে তোমাকে খালি বাড়িতে? আর একটি কথা, আমার বাড়িতে ঐখানে একটি মস্ত গর্ত আছে, ওখানে কিন্তু নামতে চেষ্টা করো না, তাহলে বিপদ হবে তোমার। তাছাড়া রান্নাঘরে কোন সময়ে যেও না। এই সব বলে, রাক্ষসী রাজকুমারকে বাড়িতে রেখে চললো তাদের রাক্ষস-সভায় যোগ দিতে।

এদিকে রাজকুমারের তো দারুণ কৌতূহল হচ্ছে দেখবার জন্য, গম্বুজের উপরেই বা কি আছে, আর গর্তেই বা কি আছে। বুড়ী ওকে এত করে বারণ করে গেল কেন? রাক্ষসী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার তরতর করে উঠে পরলো গম্বুজের ওপর। সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলো তাতে তার বুক কেঁপে উঠলো। সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো ভয়ে। সে দেখলো—একটি বুড়ো লোককে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকটির প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। 'একটু জল, একটু জল'—বলে কাতরাচ্ছে সে।

—দেখ বাপু, একটা বিশেষ কাজে আমাকে বাইরে যেতে হবে। [পৃষ্ঠা ৩১৪

রাজকুমার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কে ?

লোকটি বললো—আগে মুখে একটু জল দাও, তারপর বলছি।

রাজকুমার তখুনি তার মুখে একটু জল ঢেলে দিল।

লোকটি এবার ধীরে ধীরে বলতে লাগলো—আমি এখানকার রাক্ষসীর হাতে বন্দী হয়ে আছি বহুদিন। একটু পরেই আমার মৃত্যু হবে আর রাক্ষসী আমাকে খাবে।

কার কথা বলছো ? কে রাক্ষসী ?—রাজকুমার জিজ্ঞেস করলো।

তুমি দেখছি কিছুই জান না, তাহলে খুলেই বলি, শোন—লোকটি বলতে শুরু করলো—তুমি যাকে মা বলে ডাকো সে মানুষ নয় মোটেই, সে হচ্ছে একটি রাক্ষসী। এখন তোমাকে ছেলের মত করে পালন করছে, কিন্তু এমন এক সময় আসবে, তখন তোমাকেও খেয়ে ফেলবে। তাই বলছি, রাক্ষসী এখন বাড়ি নেই, তুমি শীগ্‌গির এখান থেকে পালিয়ে যাও। তা নইলে, আমার মতই অবস্থা হবে তোমার।

রাজকুমার বললো—তোমার কি হবে ?

লোকটি বললো—আমার কথা ছেড়ে দাও। একটু পরে আমার মৃত্যু ঘটবে, আমি সে বুঝতে পারছি। নিজেকে বাঁচাতে হলে এখান থেকে পালাও শীগ্‌গির।

রাজকুমার ঐ লোকটির কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

লোকটি সে কথা বুঝতে পেরে বললো—আমার কথা বিশ্বাস না হলে, নীচের গর্তে

নেমে গিয়ে দেখ, সেখানে কত লোকের হাড়গোড় পড়ে আছে। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

রাজকুমার তখুনি ছুটে নীচে নেমে যাচ্ছিল। লোকটি তাকে ডেকে বললো—আর একটি কথা শুনে যাও। এই রাক্ষসীর বাড়ি ছেড়ে পালাবার আগে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখবে একটি চালের হাঁড়ি আছে, সেখানে তিনটি মন্ত্রপূত বল আছে। সেই বল তিনটি সঙ্গে নিও। সেগুলো তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। বিপদ দেখলেই একটি করে বল ছুড়ে মারবে। তাহলেই তুমি রক্ষা পাবে। এই বলেই লোকটি মারা গেল।

রাজকুমার তক্ষুণি ছুটে গেল সেই গর্তে সত্যি কী আছে দেখবার জন্য।

সেখানে গিয়ে রাজকুমার দেখলো, কতগুলি হাড়গোড় পড়ে আছে। তাতে রাজকুমারের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। সেখানে রাজকুমার আর বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়ে চলে গেল রান্নাঘরে। লোকটির কথামত চালের হাঁড়িতে তিনটি সোনার বল দেখতে পেয়ে তুলে নিল। তিনটি বলই ছিল মন্ত্রপূত। তারপর রাক্ষসীর বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে পালালো।

বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর, রাজকুমার নিজের পিছনে কার ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে পিছন ফিরে তাকালো। তাকিয়েই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। যে বুড়ীকে এতদিন মা বলে জানতো সে এবার নিজের রাক্ষসীরূপ ধরে রাজকুমারকে প্রায় ধরে ফেলে। রাজকুমার খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মন্ত্রপূত বলের কথা মনে পড়ে গেল। সে তক্ষুণি রাক্ষসীর দিকে একটি বল ছুড়ে মারলো। আর অমনি সেখানে সাত-মাইল জুড়ে এক গভীর বনের সৃষ্টি হলো।

কিন্তু সেই ঘন গভীর বন পেরিয়ে আসতে রাক্ষসীর এক মিনিটও সময় লাগলো না, বড় বড় পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে এলো রাজকুমারকে আবার ধরবার জন্য।

রাজকুমার এবার দ্বিতীয় বলটি ছুড়ে মারলো রাক্ষসীর দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সাত মাইল জুড়ে বিরাট পাহাড়ের সৃষ্টি হলো। কিন্তু রাক্ষসীকে এত করেও আটকানো গেল না। সে মস্ত মস্ত পা ফেলে এত বড় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

যখন রাজকুমারের খুব কাছে চলে এসেছে, তখন রাজকুমার তৃতীয় বলটি ছুড়ে মারলো রাক্ষসীর দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাত মাইল জুড়ে সৃষ্টি হলো আগুনের। রাক্ষসী সেই আগুনের মধ্য দিয়েই ছুটে আসতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে মরলো।

এবার রাজকুমার একটু দম নেবার সময় পেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর, ধীরে ধীরে হেঁটে আসতে আসতে এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলো সে। সেখানে কয়েকটি

রাখাল ছেলে মার্বেল পাথর দিয়ে খেলছিল। রাজকুমার দেখলো তাদের প্রত্যেকের কাছে এক বাণ্ডিল করে ধানের আঁটি আছে। রাজকুমার ঐ রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে চাইলো। কিন্তু তার সঙ্গে কোন ধানের আঁটি ছিল না বলে, ছেলেরা প্রথমে তাকে খেলায় নিতে রাজী হয়নি। তারপর ঠিক হলো রাজকুমার যদি খেলায় হেরে যায়, তবে ধানের আঁটির পরিবর্তে সে রাখাল ছেলেদের গরু-ছাগল চড়িয়ে বেড়াবে সাতদিন।

রাজকুমার এতই ভাল খেলতে শুরু করলো যে এক এক করে সব কয়জন রাখাল ছেলে হেরে গেল এবং খেলার নিয়ম অনুসারে তাদের প্রত্যেক ধানের আঁটির বাণ্ডিল চলে গেল রাজকুমারের কাছে।

রাজকুমার কিছু ধান পাখিটিকে খেতে দিল।

রাখাল ছেলেদের মুখের অবস্থা দেখে রাজকুমারের দয়া হলো। সে তাদের ধানের আঁটির বাণ্ডিল অর্ধেকটা ফিরিয়ে দিল, আর বাকি অর্ধেক সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ চলার পর সে এসে উপস্থিত হলো একটি পুরোনো ভাঙ্গা মন্দিরে। সেখানে জনমানব কেউ ছিল না। এক কোণে একটি সুখপাখি চুপ করে বসে প্রায় ধুকছিল। পাখিটিকে দেখে রাজকুমারের দয়া হলো, সে তক্ষুণি তার ধানের আঁটি থেকে কিছু ধান পাখিটিকে খেতে দিল।

পাখিটি ছিল সেই রাজ্যের রাজবাড়ির দূত। খুব বেশী বুড়ো হয়ে যাওয়ায়, তাকে ঐ পুরোনো মন্দিরে রেখে আসা হয়েছিল। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছিল পাখিটি। রাজকুমার তার প্রাণ বাঁচালো। এই পাখি ইচ্ছেমত ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতো। রাজকুমারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। রাজকুমারকে দেখে সে ঠিক চিনতে পারলো—এ আর কেউ নয়। এ রাজ্যের রাজারই ছেলে যার জন্ম হয়েছিল ডিমের মধ্যে। সুখপাখি তখন মানুষের ছদ্মবেশ

ধরলো। তারপর রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়িতে একেবারে রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। রাজার কাছে রাজকুমারের জন্মবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করলো। রাজা এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলো এবং রাজকুমারকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলো। আর তার দুঃখিনী মাকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে আবার রানীর আসনে বসানো হলো।

রাজকুমার কিন্তু সুখপাখির কথা ভুললো না। সে রাজবাড়ির বাইরের দিকে এক বিশেষ ধরনের সুন্দর একটি ছোট্ট প্রাসাদ তৈরি করে দিল সুখপাখির জন্য। সুখপাখি তখন থেকে রাজকুমারদের সঙ্গে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করতে লাগলো।

---

* বর্মাদেশের উপকথা।

মজার প্রশ্ন

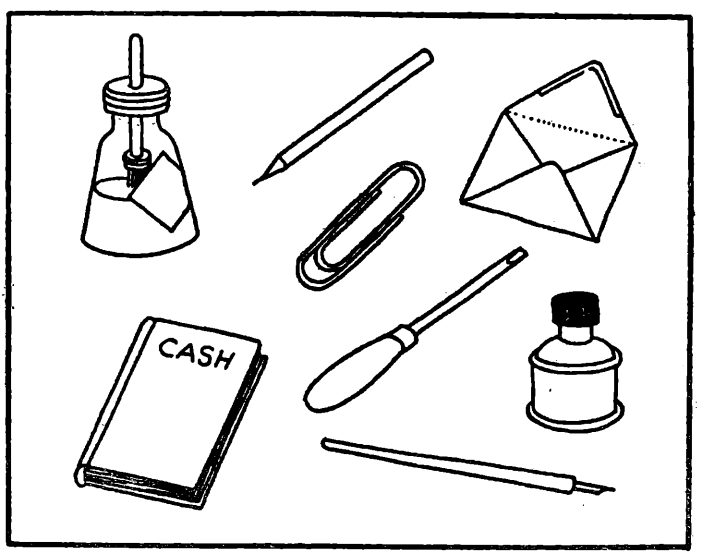

এই ছবিতে আট রকমের জিনিস আছে। তাদের মধ্যে সাতটি জিনিসকে এক-ধরণের কাজে লাগান যায়। শুধু একটি বস্তুকে ঐ একধরণের কাজে লাগান যায় না। সে বস্তুটি কি বলতে পার? (না পারলে ৩৩৪ পৃষ্ঠায় দেখ।)

● বিদেশী গল্প

ফাঁসির পরে অট্টহাসি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

সাফোকশায়ারে ছোট্ট শহর বেরী-সেণ্ট-এডমণ্ডস্। শহরের তুলনায় জেলখানাটা বড়। আর সে-জেলখানার বন্দোবস্তও ভাল। অন্ততঃ তিনটে শায়ারের যত মারমুখো দুঁদে কয়েদী, সবাইকে এনে পোরা হয় বেরীর কারাগারে। এখান থেকে এ যাবৎ কেউ জেল ভেঙ্গে পালাতে পারেনি, এমন মজবুদ এর গাঁথনি, আর এমন হুঁশিয়ার এর জেলার।

কাজেই উইলিয়াম কর্ডারের স্থানও বেরী কারার নিভৃত সেল্-এর ভিতরেই নির্দিষ্ট হল। পোলস্টেড গাঁয়ের লাল খামারে (রেড বার্ন-এ) খুন হয়েছিল মেরায়া মার্টেন। সে খুনের দায়ে ধরা পড়ে ঐ কর্ডার লোকটা। বিচার চলে দীর্ঘদিন ধরে। ততদিন আসামী আবদ্ধ থাকে বেরীতে। যতদিন ছিল, কারাধ্যক্ষ আর কারাপ্রহরীদের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল নিজের হিংস্র বদমেজাজ দিয়ে। যা হোক, অবশেষে একদিন রাতারাতি একটা ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হল জেলখানার চত্বরে, আর ভোর বেলাতেই তা থেকে লটকে দেওয়া হল খুনী কর্ডারকে।

এখন কথা এই, খুনও অনেকে করে, আর ফাঁসিও হয় অনেক খুনী আসামীর। কিন্তু ফাঁসিকাঠে উঠবার সময় বা ফাঁসির দড়ি গলায় পরবার সময় কেউ হাসির গররা ছুটিয়ে দিয়েছে গলা থেকে, এমনটা কখনো দেখা বা শোনা গিয়েছে কি? অন্য কোথাও হয়ত যায়নি, কিন্তু বেরীর জেলখানায় এই আশ্চর্য ব্যাপারটি ঘটেছিল। চাক্ষুষ দেখেছে এবং স্বকর্ণে শুনেছে একটা ম্যাজিস্ট্রেট, একটা ডাক্তার, একটা যাজক ত বটেই, তাদের বাদ দিয়েও অন্ততঃ এক ডজন কারা-কর্মচারী।

যারা দেখেছিল বা শুনেছিল, তারা অবশ্য গুজব ছড়াবার সুযোগ পায়নি। কড়া নিষেধ এসে গিয়েছিল উপর থেকে। কর্ডারের শেষ মুহূর্তের অট্টহাসিকে বিবেচনা করা হয়েছিল তার বেপরোয়া উদ্ধত মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক বলে; কর্তৃপক্ষ যা ভেবেছিলেন, তা হল স্রেফ এই কথা যে বদমাইশ খুনীটার সে-হাসি নির্জলা একটা উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। "ফাঁসি দিয়ে শাসন করবি, সে-বান্দা আমি নই"—এই ধরনের একটা আস্ফালন মাত্র। অসার্থক হলেও একটা আস্ফালন দস্তুরমত। মরণ কালে আইনের মুখের উপরে এটা ছুড়ে মারতে পেরে হয়ত বেশ একটু আত্মপ্রসাদই ও অনুভব করে থাকবে।

পাছে কর্ডারের দৃষ্টান্তে অন্য কয়েদীদেরও ভিতরে ঐরকম বেপরোয়া মনোভাব সংক্রামিত হয়, এই ভয়েই ওর সেই অসময়ের হাসিটার কথা বেমালুম চেপে যেতে চেয়েছিলেন কারাবিভাগের কর্তারা। কিন্তু বাতাসেরও কান আছে, এমন কি বাতাসের রসনারও অভাব নেই। ফলে কর্ডারের অট্টহাসির কথা অন্ততঃ গোটা চার-পাঁচ কাউন্টিতে প্রবাদের মত ছড়িয়ে পড়ল দিনে দিনে। লোকে জানল, মরার পরেও কর্ডার এখনও রোজ রাতে হানা দেয় বেরীর জেলখানায়, আর অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে তোলে গোটা বাড়িটা।

গুজব চলতে থাকুক, এদিকে বেরীর জেলখানাটা উঠে গেল বেরী থেকে। না, কয়েক একর জোড়া ইমারতটা কেউ তুলে নিয়ে গেল না, আলাদিনের গল্পের জাদুকরের মত। সেটা কে যথাস্থানেই ফেলে রেখে কারাধ্যক্ষ একদিন অন্য শহরে চলে গেলেন তাঁর ওয়ার্ডার-বাহিনী, তাঁর কয়েদী পলটন, তাঁর খাতাপত্রের পাহাড় সব কিছু সঙ্গে নিয়ে। বেরী শহরটা জায়গা ছোট, যাতায়াতের সুবিধা এখানে কম, কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একটা কারাগার এখানে রাখতে গেলে তাতে পরিবহন-খাতে অনাবশ্যক খরচা পড়ে অত্যধিক, ইত্যাকার বহুবিধ ওজর এবং আপত্তি তুলে কারাবিভাগ থেকে ফতোয়া জারি হল যে বেরীর জেল উঠিয়ে দেওয়া হোক এবং জেলখানার বাড়িটা দেওয়া হোক বিক্রি করে।

বলা সোজা মশাই, সে হুকুমটি কাজে পরিণত করা বেশ দুঃসাধ্য। কে কিনতে আসবে জেলখানা? যেখানে হাজার হাজার কয়েদীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে একশো বছর ধরে? সে-সব নিঃশ্বাস বুঝি জড়িয়ে রয়ে যায়নি ঐ ইটকাঠের গায়ে গায়ে? আর সেই কর্ডারের অট্টহাসি? সে-হাসির কথা কে না জানে মশাই এ-তল্লাটে?

পড়ে রইল বাড়ি ঢের ঢের দিন। খদ্দের জোটে না।

সরকার ক্রমাগত দাম কমিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িটা যদি আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ে এই ভাবে, সমূহ লোকসান হবে। তার চেয়ে, আধা-কড়িতে ছেড়ে দিতে পারলেও তহবিলে আসে কিছু।

এল! সেই আধা-কড়িই একদিন এল। খদ্দের জুটলেন এক থার্স টন হপকিন্স, পেশা যাঁর ভূত-তত্ত্বের গবেষণা। প্রচণ্ড শখ ভদ্রলোকের ওদিকটাতে। যেখানে ভূতের গন্ধ টের পেয়েছে কেউ, সেইখানেই ভদ্রলোক ছুটেছেন ব্লাড হাউণ্ডের মত। ভূত কতরকম। ভূতেদের মতি প্রকৃতি কীরকম, ভূতেরা কী করে, কেন করে—এ সবই তাঁর নখদর্পণে। এক কথায় ভূতের ব্যাপারের অমন বিশেষজ্ঞ সারা ব্রিটেনে দ্বিতীয় কেউ নেই।

বেরীর জেলখানায় কর্ডারের ভূত এখনও অট্টহাসি হেসে বেড়ায় রাতে-বিরেতে এ জনরবটা কেমন করে যেন ঢুকে পড়েছে হপকিন্সের কানে। সত্য মিথ্যা যাচাই করবার জন্য তিনি কারাবিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করলেন গিয়ে। সে কর্তাটি

শুধু এই খবরই রাখেন যে অট্টহাসির গুজবটা চাপা দেওয়া এবং অস্বীকার করাটাই এ-যাবৎ ছিল কারাবিভাগের নীতি। তিনি ঝেড়ে জবাব দিলেন—"আপনার মুখে এরকম কথা শুনে অবাক হয়েছি স্যার! এই বৈজ্ঞানিক যুগেও কেন ভদ্রলোক যে ভূতের মত অবাস্তব পদার্থ এবং ভূতের হাসির মত অশ্বডিম্বে বিশ্বাসী হতে পারেন, তা কে জানত!"

ভোরবেলাতেই লটকে দেওয়া হল খুনী কর্ডারকে। [পৃষ্ঠা ৩১৯

কর্তা ভেবেছিলেন—তাঁর তরফ থেকে ও-রকম জোরালো অস্বীকৃতি শুনবার পরে বাড়ি কেনার ব্যাপারে হপ্‌কিন্স মহাশয়ের সব দ্বিধা এক মুহূর্তে কেটে যাবে। 'কিনব' বলে সেইখানে একসনে বসেই তিনি দরদাম ঠিক করে পাকা কথা দিয়ে যাবেন। কিন্তু হায় ভগবান! এ যে উলটো বুঝলি রাম হয়ে গেল! কর্তার আর হাসে না শুনে অমন উৎসাহী খদ্দেরটা যেন মিইয়ে গেল একেবারে, 'পরে খবর দেব' বলে হাত বাড়িয়ে দিল বিদায়ী করমর্দনের জন্য।

কথাবার্তা সব ভেস্তেই যেত; গেল-না যে, সেজন্য যা-কিছু ধন্যবাদ, তা পাওনা হল ডিপার্টমেণ্টের কনিষ্ঠ কেরানী ডেভিডসনের। একান্তই দৈবানুগ্রহ বলা যেতে পারে এটাকে, কিন্তু ডেভিডসন ছিল হপকিন্সের খুড়তুতো মামীর ভাসুরপো, ভূত এবং ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার সম্বন্ধে হপকিন্সের প্রবল আগ্রহের কথা তার অজানা ছিল না। হপকিন্স যে বেরীর জেলখানা কিনতে চাইছেন, সে-খবরটাও জানা ছিল তার।

এখন হপকিন্স ত আশাহত হয়ে মলিনমুখে নেমে যাচ্ছেন সিঁড়ি দিয়ে, সেই সিঁড়িতে দেখা ডেভিডসনের সঙ্গে। ওকে দেখা মাত্রই হপকিন্স ফেটে পড়লেন রাগে—"আজে-বাজে গুজবে কান দিয়ে বেশ খানিকটা বেফায়দা ঝামেলা পোয়াতে হল বন্ধু! ভূতের হাসি নাকি কস্মিনকালে কেউ শোনেনি বেরীর জেলাখানায়। তাই যদি হবে, আমাকে তা হলে টেনে আনার অর্থ কী এ-ব্যাপারে? একটা পুরোনো জেলখানা কিনে আমার কী ফায়দা হবে শুনি? আসলে ত আমি কিনতে চেয়েছিলাম সেই হাসিটাই—"

"ভূতের হাসি কস্মিনকালে কেউ শোনেনি বেরীতে, এই কথা আই. জি. বললেন নাকি আপনাকে?"—রহস্যটা ঠিকই আঁচ করে ডেভিডসন।

"বললেন না?"—রীতিমত ঝাঁজালো হপকিন্সের কণ্ঠস্বর, বললেন বেশ রসান দিয়েই। বললেন—"ভূতের হাসিটা নাকি অশ্বডিম্ব। শোনো একবার, অশ্বডিম্ব!"

ডেভিডসন কাঁধে হাত দিয়ে কানে কানে বলল হপকিন্সের—"সাহেব এ বিভাগে নতুন, তা জানেন না বুঝি? উনি অফিসের হাল-হদ্দ জানেন না কিছু, কিসের জন্য কী করা হয়েছে, বুঝে নিতে পারেন নি এখনো। ভূতের হাসি মোটেই অশ্বডিম্ব নয়, ডিপার্টমেণ্টে পুরোনো লোক যত আছে, সবাই যাতে হলপ নিয়ে সেকথা আপনাকে শোনায়, তার আমি ব্যবস্থা করছি।"

সেদিনকার মত হপকিন্সকে বিদায় দিয়ে ডেভিডসন এত্তেলা পাঠাল—সে একবার বড় সাহেবের সঙ্গে কথা কইতে চায়। ঠিক কী-রকম ভাবে ও ভাষায় সে কথা কইল সেই সাক্ষাৎকারে, সে-বর্ণনা এখানে দেবার দরকার নেই। কিন্তু তার ফলে হপকিন্সের কাছে একখানা আধা-সরকারী চিঠি গেল দুই একদিনের মধ্যেই, যার মর্ম হল এই যে ভূতের হাসি-বিষয়ক ব্যাপারটা সম্বন্ধে কারাবিভাগ তাঁর সঙ্গে আর এক দফা আলোচনা করতে চায়। পূর্ববর্তী আলোচনায় ভুলক্রমে তাঁকে অসত্য খবর দেওয়া হয়েছিল। হাসিটা আদৌ অশ্বডিম্ব নয়।

অন্ততঃ দশটা পুরোনো কর্মচারী কারাবিভাগের, অন্ততঃ দশখানা পুরোনো ফাইল এদিনকার কথাবার্তার সময়ে হাজির করা হল হপকিন্সের সামনে। কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করে এবং ফাইলগুলো পড়ে হপকিন্স এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে—

যাক সে কথা। এক মাসের মধ্যেই হপকিন্স মালিক হয়ে বসলেন বেরীর ভূতপূর্ব জেলখানায় এবং ঐ এক মাস পরেই কনিষ্ঠ কেরানী ডেভিডসনের প্রমোশন হয়ে গেল জ্যেষ্ঠ শ্রেণীতে।

হপকিন্সেয় আনন্দের অবধি নেই। তিনি সপরিবারে উঠে এলেন ভূতপূর্ব জেল-খানাতে। কারাধ্যক্ষের বাড়ি যেটা ছিল আগের আমলে, সেইটাই হল তাঁর বাসগৃহ। কয়েদীদের ব্যারাকগুলি ভেঙ্গেচুরে আধুনিক বাসগৃহে পরিণত করার পরামর্শ অনেকেই দিয়েছিল তাঁকে। তা করলে ওগুলো ভাড়া হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে, প্রচুর পয়সা আমদানি হতে পারত তা থেকে। কিন্তু হপকিন্স ও পথ মাড়াতে রাজী নন! ব্যারাক যেভাবে আছে, সেইভাবেই থাকবে। তাতে যদি কেউ ভাড়া নিতে রাজী থাকে, নিক। ভাঙ্গতে তিনি নারাজ। বাড়ির চেহারা যদি বদলে দেওয়া হয়, কর্তারেরা রাতের বেলায় এসে হয়ত চিনতেই পারবে না তাদের পুরোনো আড্ডাকে, অট্টহাসি না হেসে নীরবে দীর্ঘশ্বাস

ফেলতে ফেলতে হয়ত তারা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে আবার। অমন বোকামি করবেন না হপকিন্স।

তা, যে-অবস্থায় আছে—সেই অবস্থাতেই কিছু কিছু ভাড়া হয়েও গেল ব্যারাক। গুদোম করবার জন্য ভাড়া নিল ব্যবসায়ীরা। এ-ব্যবস্থা বেশ মনোমতই হল হপকিন্সের। গুদোমের কাজ ত দিনের বেলায়। রাতে সব নিঝুম পুরী। ভূতেদের সেখানে হাজিরা দেওয়ার অসুবিধা বিছু নেই। কর্ডার অবশ্যই আসবে এবং হাসবে সেই অট্টহাসি, যা শুনবার লোভেতেই মংলগ পয়সা ঢেলে হপকিন্স এই বিটকেল ইমারতগুলির মালিকানা লাভ করেছেন।

কিন্তু, দিন ক্রমে কেটে যায়, কোথায় সে হাসি? কর্ডার ত আসে না!

হপকিন্স বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর চটে যাচ্ছেন। বিশেষ করে সেই খুড়তুতো মামীর ভাসুরপো ডেভিডসনের উপরে। তিনি ত রেগে-মেগে চলেই আসছিলেন 'কিনব না' বলে, ঐ লোকটাই ত ফাঁদে ফেলল তাঁকে!

তবে হ্যাঁ, হাসি শুনতে না পান, অন্য একদিকে হপকিন্সের একটা সুযোগ ঘটে গেল একদিন। এ বাড়ি না কিনলে তা হত না।

বেরীর এক মুর্দাফরাস একদিন এসে দেখা করল তাঁর সঙ্গে। এখানে যখন জেলখানা ছিল, জেলের মড়াদের গতি এই লোকটির হাত দিয়েই হত। নাম এর হাউলার।

খ্রীষ্টান মাত্রই মরবার সময় এই আশা নিয়ে মরে যে গির্জাসংলগ্ন কবরখানার পবিত্র ভূমিতে সমাধি লাভ করবে তার দেহটা। তবে সবাইয়ের ক্ষেত্রেই যে সে আশা ফলবতী হয়, তা নয়। খুব মহাপাপী যারা, এমন কিছু কিছু লোক বঞ্চিতও হয় সে সৌভাগ্য থেকে। গির্জার কবরখানায় স্থান পায় না তাদের শব। বাইরের কোন অপবিত্র পোড়ো জায়গাতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হয় তাদের। সমাধি দেওয়ার বেলায় ধর্মীয় কৃত্য কিছু আছে, এসব হতভাগ্যের বরাতে তাও সব সময় জোটে না।

কর্ডারেরও জোটেনি।

জেলখানাতে ফাঁসি হয়ে গেল নরহন্তার। গিজা রাজী হল না তার মৃতদেহকে গ্রহণ করতে। ঐ মুর্দাফরাস হাউলারের হাতেই শবটা তুলে দিলেন কারা-কর্তৃপক্ষ। হাউলার এক বনের ভিতর পুঁতেও ছিল সেটাকে, কিন্তু দুই একদিন পরেই তা তুলতে হল আবার।

তুলতে হল, কারণ দেহটার এক খদ্দের পেয়ে গেল হাউলার। লণ্ডনের এক বেসরকারী হাসপাতাল। ছাত্রদের পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদ দরকার, শব না কিনে হাসপাতালের উপায় কী?

হাউলার কিন্তু এ কর্ম আগে কখনও করেনি, মড়া যখনই হাতে পেয়েছে, কবর দিয়েছে বনের ভিতরে। কিনে নেবার প্রস্তাব আগে সে পায়নি কখনো, প্রলোভনেও পড়েনি। কিন্তু এবার এল প্রস্তাব, প্রলোভন জয় করা শক্ত হল বেচারী হাউলারের পক্ষে।

কিন্তু বিবেকেও বাধে। হলই বা মুর্দাফরাস, তার কি আর বিবেক বলে কিছু নেই? বড় দোটানায় পড়ে গেল বেচারী। কবর থেকে মৃতদেহ তোলা বে-আইনী তো বটেই, কিন্তু সেটা বড় একটা গ্রাহ্য করে না ও। ও ভাবছে—জিনিসটা পাপ বলে গণ্য হবে ভগবানের দপ্তরে। কবর দেবার পরে মড়াটা খুঁড়ে তোলা এবং বিক্রি করে দেওয়া?—অন্যথায়।

কিন্তু খুঁড়ে না তুললে মবলগ পয়সা মাঠে মারা যায় যে!

তখন অনেক ভেবে হাউলার একটা ফন্দী বার করল। দেহটা সে বেচবে, কিন্তু মাথাটা নয়। ঐ মাথাকে সে নতুন করে কবর দেবে আবার। মাথাই ত উত্তমাঙ্গ, মাথার কবরই কবর। দেহের বরাতে যা ইচ্ছে তাই হোকগে না!

সেই ফন্দী অনুযায়ীই কাজ করল সে। হাসপাতাল মুণ্ডহীন ধড়টা নিয়ে গেল, হাউলার মুণ্ডটাকে আবার কবরস্থ করে সান্ত্বনা দিল নিজের বিক্ষুব্ধ বিবেককে।

এই গেল আগের ব্যাপার। এখন হোক বর্তমানের কথা।

হাউলার কষ্টে পড়েছে। বুড়ো হয়েছে, খাটতে পারে না আগের মতন। এদিকে জেলখানা উঠে যাওয়ার দরুন এখানকার চাকরিটাও সে হারিয়েছে। দিন চলা দায়।

এই অবস্থায় সে শুনতে পেয়েছে একটা খবর। জেলখানার বর্তমান মালিক নাকি কর্ডার সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী। তার ভৌতিক হাসি শুনবার আশাতেই তিনি নাকি এই ইটের গাদাগুলো কিনে নিয়েছেন দেদার অর্থ ব্যয় করে। হাসি তিনি শুনতে পেয়েছেন কিনা, তিনিই জানেন। কিন্তু সে হাসি যে মুখ থেকে বেরিয়েছিল, সেই মুখখানা যদি হাউলার তাঁকে এনে দিতে পারে, নেবেন কি মালিক?

মালিক লাফিয়ে উঠলেন প্রস্তাব শুনে। নেবেন না কেন? অবশ্যই নেবেন। মুখ অর্থাৎ মাথা! মাথার আকর্ষণে মাথার মালিকই এসে হাজির হবে একদিন! আসে যদি হাসতেও পারে! ও-মাথা হপকিন্সের চাই-ই।

হাউলার মাথাটা এনে দেখাল। তারপর হপকিন্সের আদেশমত সেই মাথাকে পরিষ্কার করে ফেলল। হাড় ছাড়া তাতে আর অবশিষ্ট রইল না কিছু। হপকিন্স তখন সেই খুলিটা দিলেন লণ্ডনে পাঠিয়ে। সেখানকার কারিগরেরা ওটা আরও পরিষ্কার করে পালিশ লাগিয়ে দিল ওতে। চাঁদিতে ফিকে গোলাপী রং, দাঁতে সাদা রং, আর চোখের গর্ত দুটোতে কাচের চোখ প'রে খুলিটার বাহার খুলল খুব।

বাড়ি নিয়ে এসে হপকিন্স একটা কাচের বাক্সে পুরে ফেললেন ওটা, বাক্সটা সাজিয়ে রাখলেন ড্রয়িংরুমে একখানা টিপয়ের উপরে। দেখা যাক, এইবার কর্ডার আসে কিনা।

তা, দুই একদিন পরেই কর্ডার এল।

ড্রয়িংরুমে বসে আছেন হপকিন্স লাঞ্চের পরে, ভৃত্য এসে খবর দিল—এক আধাবয়সী ষণ্ডা গোছের লোক দেখা করতে চাইছে—

"কী রকম লোক?"—জিজ্ঞাসা করলেন হপকিন্স।

"মাথায় লোমওয়ালা টুপি, গলা খোলা লাল চেক-এর জামা—"

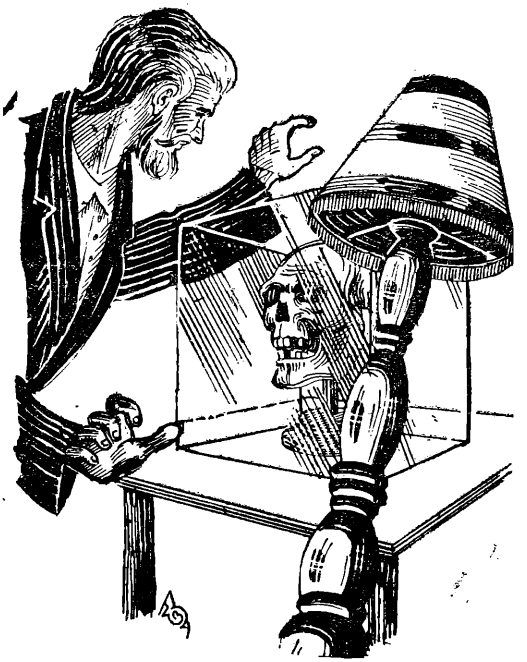

বাক্সটা সাজিয়ে রাখলেন ড্রয়িংরুমে একখানা টিপয়ের উপরে।

হপকিন্সের মনে পড়ে গেল। টনক নড়ল বলতে গেলে। সেই হাউলার একটা বর্ণনা দিয়েছিল কর্ডারের চেহারার। হপকিন্সের প্রশ্নের জবাবেই বলেছিল অবশ্য কথাটা। ফাঁসি কাঠে যখন তোলা হল ওকে, ওর মাথায় ছিল লোমওয়ালা টুপি, ওর গায়ে ছিল লাল চেক কাপড়ের গলা-খোলা কোট।

"নিয়ে এস ত মানুষটাকে!" হুকুম দিলেন হপকিন্স। দিলেন, তবে ততটা উৎসাহের সঙ্গে নয়। দিনের বেলায় ভূতেরা কেমন যেন বেমানান। ঝলমলে রোদ্দুর রহস্য রোমাঞ্চের পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল নয়। আর সে পরিবেশ না থাকলে আসল ভূতকেও জোলো মনে হবে।

"নিয়ে এস"—হুকুম দিয়েছেন হপকিন্স, কিন্তু ভৃত্য পারল না তাকে নিয়ে আসতে। ও ফিরে গিয়ে আর দেখতে পায়নি লোকটাকে।

হপকিন্স মনে মনে হাসলেন। মাথা আটক পড়েছে, কর্ডার না এসে করবে কী? আসতেই হবে। হাসতেই হবে সেই অট্টহাসি, যার আগাম দাম কারাবিভাগকে গুনে দিয়ে এসেছেন হপকিন্স, কয়েকমাস আগেই।

তার পরের দিনও।

সকাল বেলায় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন হপকিন্স, সমুখেই সেই লোমওয়ালা টুপি, সেই লাল চেক-এর গলাখোলা জামা। আগেকার দিনে আস্তাবল ছিল যে-ঘরটা, এখন গ্যারেজে পরিণত হয়েছে, তারই দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দেবার চেষ্টা করছিল মূর্তিটা, হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাল, চোখোচোখি হল হপকিন্সের সঙ্গে, তার পরেই চোখের পলকে অদৃশ্য।

আর সন্দেহ থাকতে পারে না। আনাগোনা শুরু হয়েছে ভূতের।

হপকিন্সকে কিন্তু সাবধান হতে হল। কর্ডার খুশী নয় তাঁর উপরে। এক পলকের জন্য ঐ যে চোখোচোখি হল তাঁর সঙ্গে, তাইতেই ওর চোখের ভাষা উনি পড়ে ফেলেছেন। সে-চোখ ছিল হিংস্র, তার ভাষা ছিল জিঘাংসা। জীবনকালে কর্ডার ছিল খুনে ঘাতুক, মরণের পরেও যে তাই রয়ে গিয়েছে, ঐ চোখের দৃষ্টি দেখবার পরে কারও আর সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

তবে, কথা এই যে ভূত আর করবে কী হপকিন্সের? ওরা হাসুক কাশুক ভেংচি কাটুক, সত্যিসত্যি কারও ঘাড় মটকাবার ক্ষমতা ওরা রাখে—এমনটা হপকিন্স বিশ্বাস করেন না। তবু, হ্যাঁ, সাবধান উনি আছেন, থাকবেনও।

সেইদিনই ডিনারের পরে প্রমাণ হয়ে গেল যে সাবধান হয়েও ভূতের হামলা থেকে বাঁচা যায় না। হপকিন্স বসে ছিলেন লাইব্রেরীঘরে, তার পাশের ঘরটাই সেই ড্রয়িংরুম। বসে বসে একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন ভদ্রলোক, প্রেততত্ত্বের বই।

এমন সময়ে ঠিক তাঁরই সামনেই যেন একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল। ঘরের মেঝেটা—তাঁর চেয়ার থেকে তিন চার ফুট দূরত্বের ভিতরেই—দুলে উঠল আচমকা, আর হপকিন্স চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই বিকট একটা আওয়াজ তুলে মেঝেটা ফেটে যেন চৌচির হয়ে গেল। নীচে থেকে ভলকে ভলকে উঠতে লাগল কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত পূতিগন্ধ, নিশ্ছিদ্র!

হপকিন্স হতচকিতের মত তাকিয়ে আছেন সেই দিকে, নাকে রুমাল চাপা দেবার মতলবে হাতখানা সবে ঢুকিয়েছেন পকেটে, এমন সময়ে তুমুল একটা শোরগোল ড্রয়িংরুমে। মানুষ গরু কুকুর শেয়াল বাঘ বেবুন সব যেন একসাথে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে মরছে নিদারুণ আক্রোশে।

ওখানে এখন না-যাওয়াই উচিত, কথাটা মনে না পড়েছিল, এমন নয়। তবু কী জানি কেন লাইব্রেরী ছেড়ে ড্রয়িংরুমের দিকেই ছুটলেন হপকিন্স। ডাইনিংরুমের ভিতর দিয়ে সোজা পথ, ছুটলেন সেই পথেই। দরজা বন্ধ ছিল ওদিককার,—খুলে ফেলতেই মনে হল—একটা ঘূর্ণিঝঞ্ঝা যেন এসে আছড়ে পড়ল তাঁর মুখে বুকে সর্বাঙ্গে। তারই

ধাক্কায় হপকিন্স পিছন পানে ছিটকে এসে পড়লেন ডাইনিং টেবিলের উপরে। গড়িয়ে পড়ার সময় ঐ টেবিলেরই পিতলে বাঁধানো কোণটা লেগে গেল কপালে, কাটল কিনা, রক্ত পড়ছে কিনা, সে-চিন্তা করার আর সময় হল না তাঁর, মেজেতে গড়িয়ে পড়লেন মূর্ছিতের মত।

আর গড়িয়ে পড়তে পড়তে হপকিন্স শুনতে পেলেন—একটা আকাশ-ফাটানো দানবীয় অট্টহাসিতে গমগম করছে সারা বাড়িটা।

জ্ঞান যখন ফিরল, তখন হপকিন্স সোফায় শুয়ে আছেন লাইব্রেরীঘরে, চাকরেরা তাঁকে তুলে এনেছে এখানে। এসেছেন তাঁর স্ত্রীও উপর থেকে নেমে, ভদ্রমহিলার মুখে উদ্বেগ আর ভয়ের সঙ্গে সমান ওজনে যে মিশে আছে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার চিহ্ন, তা হপকিন্সের বা ভৃত্যদের কারোই বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ভূতের ব্যাপারে স্বামীর এই অলক্ষুণে কৌতূহল এই ভদ্রমহিলার চিরদিনই অপছন্দ।

কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে, সেটা খেয়াল করেননি হপকিন্স, তিনি যে-জিনিসটা খেয়াল করেছেন, তা হল এই লাইব্রেরি ঘরে ধোঁয়া আর নেই ; এবং তার চেয়েও যা বড় কথা, ঘরের মেঝে ফাটেও নি, চটেও নি।

হপকিন্স উঠে এইবার ড্রয়িংরুমের দিকে গেলেন। যতই ভয় করুক, তাঁর স্ত্রীকেও কাজেই যেতে হল, এবং যতই অনিচ্ছা থাকুক, তাঁর ভৃত্যদেরও। সবাই গিয়ে দেখলেন—ড্রয়িংরুমের অবস্থা লাইব্রেরীর মত শান্ত নয় মোটেই। ঘরময় ছড়িয়ে আছে কাচের আর হাড়ের টুকরো। কর্ডারের মাথাটা বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তার কাচের আধার-সমেত।

কর্ডারের অট্টহাসি আর কখনও শুনতে পাননি হপকিন্স।

* ব্র্যাডক-এর "ইভিল হন্‌টিঙ্‌স্‌" অবলম্বনে।

---

৩১২ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১১টি মাছের ছবি।

ওঃ, কি মজা! কি মজা!
সাবধানে উঠো! পড়ে যেওনা যেন।

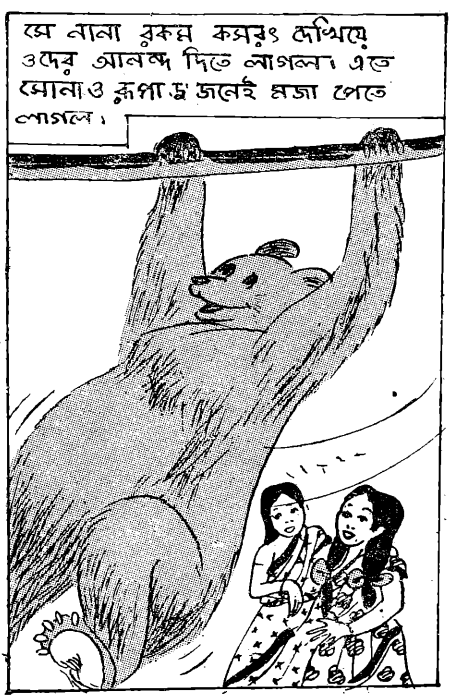
সে নানা রকম করতুং দেখিয়ে ওদের আনন্দ দিতে লাগলো। এতে সোনাও রূপা দু'জনেই মজা পেতে লাগলে।

ওর বিরাট শরীরটা নিয়ে ও যা করতো তাতেই মজা লাগত

আবার ওদের দুজনকে কোলে নিয়ে নাচতো।

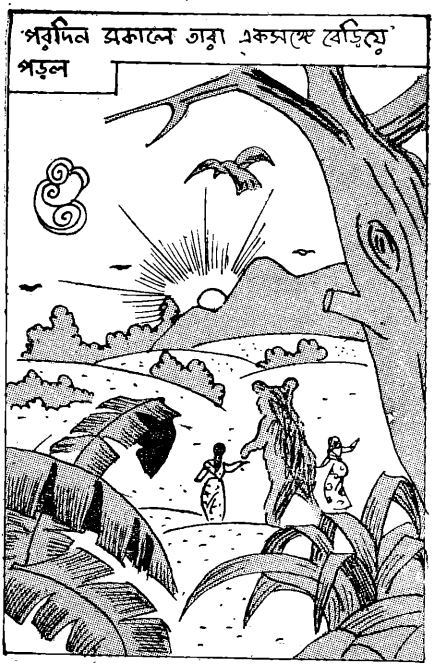
পরদিন সকালে তারা একসঙ্গে বেড়িয়ে পড়ল
৫

খুব উঁচু ডালে যেখানে ওদের হাত যেত না সেখান থেকে আনন্দ ফল-ফুল পেড়ে দিত

একদিন
এবার আমাকে যেতে হবে।
৬

(চলবে)

শৈলেশ ভড়

তোমরা হয়ত ভাবছ দানধ্যান করা একমাত্র বড়দেরই শোভা পায়। বিশেষ করে দানটি যখন অমূল্য।

আসলে কিন্তু তা নয়।

এই দানের দাতা তোমাদেরই মত একটি ছোট্ট ছেলে। আর যে রত্ন সে দান করেছিল তার মূল্য কোন জহুরী আজ পর্যন্ত যাচাই করতে পারেনি।

এই সত্য ঘটনাটি শুনলে তোমরা নিজেরাও তার মূল্যায়ন করতে পারবে না।

ব্যাপারটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি।

বেশ সুখের সংসার ছিল ওদের।

বাবা, মা আর দুটি ছেলে।

বাবা জন মেইন ছিলেন ইটালির প্রখ্যাত একজন আইনজ্ঞ।

মা নেলী যেমন দয়াময়ী তেমনি স্নেহময়ী। ঘর সংসারের কাজ নিয়ে তিনি সারাদিন ব্যস্ত।

বড় ছেলেটির বয়স মাত্র সতেরো। নাম জনাথন।

ছোট ছেলের নাম গ্রেগারি। সবাই ডাকত গ্রেগ বলে। আমরাও তাই ডাকব। বয়স মাত্র চোদ্দ বছর।

ওরা সবাই মিলে গত বছর ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল নেপল্‌স্ শহরে।

'শুধু বই পড়লে আর পরীক্ষায় পাস করলে শিক্ষা পাকা হয় না।' এ কথা বলেছিলেন বাবা জন মেইন। 'নিজের দেশকে অবসর সময় ঘুরে দেখা একটা অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।'

সত্যি বলতে কি, আমাদের ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ রেওয়াজ নেই। তোমরা বড় হয়ে এটা প্রবর্তন কোরো, কেমন ?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম।

ইটালির নানাদেশ ঘুরে ওরা এলো পম্পাইতে।

জানো তো, এই পম্পাই শহর বহুদিন আগে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখনো সে ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু আছে। গাইড ওদের সেইসব জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো এবং খুব সহজ কথায় সব বুঝিয়ে দিল।

সারাদিন ধরে ওরা খুব আনন্দ করলো। বেড়ালো, নদীর ধারে রেস্টুরেণ্টে বসে পেটভরে খেলো, ছুটোছুটি করলো, লাফালো, দৌড়লো। খুশির বন্যায় ওরা ভাসতে লাগলো।

ফেরার পথে মোটর গাড়ির মধ্যে হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই গ্রেগ রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়লো।

"বড্ড মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে মা, আমি আর বসে থাকতে পারছি না।' গ্রেগ লুটিয়ে পড়লো।

মা ধরে ফেললেন ছেলেকে, 'সে কি বাবা, কী হল তোমার ?'

সযত্নে ধরে গ্রেগকে তিনি কোলের ওপর শুইয়ে দিলেন।

গাড়িটা তখন প্যাসিফিক সমুদ্রের উপকূল দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। গাড়িটা চালাচ্ছিলেন জন মেইন। এবার তিনি গতিটা অনেক শ্লথ করে দিলেন।

'কতক্ষণ ধরে এমন যন্ত্রণা হচ্ছে ?' জিজ্ঞেস করলেন জন মেইন।

'অনেকক্ষণ।' কোনরকমে বললে গ্রেগ।

বাইরে উত্তাল সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জন। সোঁ সো হাওয়া বইছে। জোলো ঠাণ্ডা হাওয়া। হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। সমুদ্রপাখিগুলো নীল আকাশের নীচে ডানা ছড়িয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা পাখি আবার ঢেউয়ের জলে পা ডুবিয়ে কাঁকড়া খাচ্ছে।

মা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'ওগো, গ্রেগ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।'

গাড়ির গতি আবার বাড়লো।

তাড়াতাড়ি একটা মাঝারি রকমের হাসপাতালে নিয়ে আসা হল তাকে।

ডাক্তার ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, 'ব্রেনে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। এ রুগী বেশিক্ষণ বাঁচবে না।'

কথা শুনে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্তে বাবা মা'র দুচোখ থেকে নিভে গেল।

দুজনেই অস্ফুটস্বরে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'বাঁচবে না, হা ভগবান।'

কিছুক্ষণ আগেও যে সুস্থ ও সবল ছিল, এখন সে মুমূষু। যে কুঁড়ি একদিন সুগন্ধি ফুল হয়ে ফুটে উঠতে চেয়েছিল সে আজ অকালে ঝরে যাচ্ছে। যে কিশোর তার ডাগর নীল দুটি চোখে আলোর সুধা পান করতে চেয়েছিল সে আজ নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারছে না। মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত থেকে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান তাকে ছিনিয়ে আনতে পারবে না।

তাড়াতাড়ি শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসা হল।

তিনিও পরীক্ষা করে একই কথা বললেন, 'না, এ রুগী বাঁচবে না। আর বড় জোর ঘণ্টা চারেক।'

গ্রেগের মুখের মধ্যে একটা নল পুরে পাম্প করে অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছে লাঙ্‌সে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। একবার শেষ চেষ্টা করছেন হাসপাতালের দয়ালু ডাক্তাররা।

মা কাঁদছেন।

দাদা জনাথন কাঁদছেন।

আর বাবা জন মেইন পাথরের মত একদৃষ্টে চেয়ে আছেন ছেলের কচি মুখের দিকে। যে মুখে তিনি আর কোনদিন আদর করে চুমু খেতে পারবেন না। যে মুখ আর কোনদিন বলবে না 'বাবা, তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো, দাদাকে না আমাকে?'

আহা, সেই সুন্দর মুখটি রোগে যন্ত্রণায় শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

আর সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে জন মেইনের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

কিছুদিন আগে গীর্জার ফাদার এসেছিলেন জনের কাছে। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, 'কোন মানুষই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে না। আমি, তুমি আমরা সবাই একদিন মরে যাব।'

কথাটি শুনে গ্রেগ বাবাকে বলেছিল, 'তাহলে এত ঘটা করে কবর দেবার দরকার কী? আমাদের যা কিছু আছে মৃত্যুর পর অপরকে দান করা উচিত। অন্ততঃ আমার বেলায় তাই যেন হয়।'

'তার মানে?' হেসে প্রশ্ন করেছিলেন বাবা জন মেইন, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'আমার মৃত্যুর পর' খুব সহজভাবে বলেছিল গ্রেগ, 'আমার যা কিছু থাকবে তা অভাবীকে দিয়ে দিও। আমার এই দেহটাও যদি কারোর কাজে লাগে তাই দিয়ে দিও।'

রবারের নল দিয়ে পাম্প করা হচ্ছে অক্সিজেন।

অসহ্য একটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে গ্রেগ।

জন মেইন ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কি বাঁচবার কোন আশা আছে?'

ডাক্তাররা একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানালেন—না।

গ্রেগের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চেয়ে জন মেইন চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ, প্লিজ স্টপ।'

ডাক্তাররা মাথা নাড়লেন। নার্সরাও। না তা হয় না। রুগীর প্রতি তাঁদের একটা কর্তব্য আছে। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য। এই তাঁদের মন্ত্রসাধন।

কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রেগ নিভে আসতে লাগলো। সমস্ত দেহ অসাড় পঙ্গু হয়ে আসছে। জীবনীশক্তি নিঃশেষিত। দৃষ্টি অর্থহীন, ঘোলাটে।

একটু পরে গ্রেগ মারা গেল।

ডাক্তার নার্স সবাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মৃতের মুখের ওপর কাপড়টা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

'মে গড্ ব্লেস হিম্।'

জন মেইনও বেরিয়ে এলেন ওঁদের সঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে হাসপাতালের বড় ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

আন্তরিক সমবেদনা জানালেন বড় ডাক্তার, 'মে গড্ ব্লেস হিম্।'

জন মেইন তবুও অটল অচল।

'কিছু বলবেন আমাকে?' দরদী গলায় প্রশ্ন করলেন বড় ডাক্তার।

'হ্যাঁ।'

'বলুন।'

'গ্রেগের, মানে আমার মৃত ছেলেটির ইচ্ছে ছিল', ধরা গলায় কোনরকমে বললেন জন মেইন, 'ও মারা যাবার পর ওর সব কিছু দিয়ে যাবে। সেই কথাই সে আমাকে একদিন বলেছিল।'

'তার মানে?' অবুঝ ডাক্তার বোকার মত বললেন, 'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

হাসলেন জন মেইন। হাসিটা কান্নার চেয়েও করুণ দেখালো। বললেন, 'ও তো চলেই

গেলো। ওর চোখ, লাঙ্‌স, হার্ট, কিডনি, লিভার ইত্যাদি যদি সযত্নে রেখে দেন আপনাদের কাছে। কারোর প্রয়োজনে কোনদিন লাগতেও তো পারে।'

ডাঃ রাফেল কার্টেসিনি আনন্দের আতিশয্যে জনের হাতদুটো উষ্ণ আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ইটালিতে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। গ্রেগের দেহ থেকে আমরা যা পাব তাতে অনেকের উপকার হবে। এমন অমূল্য দান আমাদের দেশে আর কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। বিশেষ করে এত অল্প বয়সে।'

সেইদিনই জন মেইন দানপত্রে সইসাবুদ করে সকলকে নিয়ে শহরে ফিরে এলেন।

খাঁ খাঁ করছে বাড়ি। মনটাও কেমন যেন হুহু করে উঠলো। কে যেন ছিল, এখন কে যেন নেই। অথচ সেই আজ বাড়িতে সবচেয়ে বেশী করে উচ্চারিত, প্রকাশিত ও উদ্‌ঘাটিত।

আরো কয়েক সপ্তাহ পরে জন মেইন একটা চিঠি পেলেন।

মিসেস্ ম্যাটাওলি নামে এক ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়েছেন, 'আপনার ছেলের চোখ আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীকে ভোগ করবার সুযোগ দিয়েছে। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।'

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে জন মেইন উত্তর লিখলেন, 'আমার গ্রেগ আমার সঙ্গে থেকে যে আনন্দ দিত, তার মৃত্যুর পরেও সে আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। সে মরে নি, সে মরতে পারে না। সে তার দেশের লোকের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাদের সুখ আনন্দের মধ্যে তারও অংশ আছে। এ যে আমার কাছে কত বড় সান্ত্বনা তা আপনাকে লিখে বোঝাতে পারবো না। মৃত্যু যে কত সুন্দর হতে পারে আমার গ্রেগের দান তাই প্রমাণ করলো। আর পৃথিবীতে যারা জন্মায় তারা সবাই মরে না। কেউ কেউ বেঁচেও থাকে। গ্রেগও থাকবে।

---

৩১৮ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর

স্ক্রু ড্রাইভার আলাদা

অদ্রীশ বর্ধন

১৮৯২ সালের সেই স্মরণীয় দিনটি আজ আর কারো মনে নেই। ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল কেনটাকিতে। মুরের আদালত প্রাঙ্গণে কাতারে কাতারে জড়ো হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। নাথন স্টাবলফিল্ড নামে কে এক মাথাপাগলা নাকি খুব তড়পে বেড়াচ্ছে। বিনা তারে শূন্য দিয়ে গানবাজনা কথাবার্তা পাঠানোর কল বানিয়েছে পাগলাটা। মাথার স্ক্রু ঢিলে না থাকলে এমন কথা কেউ বলে? তার ছাড়া টেলিফোন হয় না। তার ছাড়া টেলিগ্রাফও হয় না। সুতরাং বিনা তারে কথাবার্তা বলা, উন্মাদ কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই পাগলামি দেখতে দলে দলে লোক এলো আদালত প্রাঙ্গণে।

চারকোনা চত্বরটা লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় দুশ ফুট। চত্বরের দু'প্রান্তে দুটো বাক্স। মাপ এক—লম্বায় দু'ফুট, চওড়ায় দু'ফুট। বাক্সের গায়ে লাগানো শুধু একটা টেলিফোন—আর কিছু নেই।

একটা বাক্স নিয়ে বসল নাথন—অপরটায় তার ছেলে।

বাপ-বেটায় দিব্যি কথাবার্তা চলল টেলিফোনে। চত্বরের দু'পাশে বাক্স ঘিরে যারা রগড় দেখছিল, তারাও স্পষ্ট শুনলো কথাগুলো। সত্যিই কথাগুলো যেন শূন্য দিয়ে উড়ে এল চত্বরের একদিক থেকে আর একদিকে!

ঘটনাটা ঐতিহাসিক। ফলটা কিন্তু ভাল হল না। লোক এসেছিল শুধু রগড় দেখতে, মজা করতে—নাথনকে মাথায় তুলে নাচতে নয়। তাই বেতার-ভেল্‌কি শেষ হতেই টিটকিরির আওয়াজে কানপাতা দায় হল। অপমানে কান পর্যন্ত লাল হয়ে গেল

নাথনের। বিষম রাগ হল নিজের বোকামির জন্যে। নিজেই নিজের মুণ্ডপাত করতে করতে কলকবজা মাথায় তুলে চম্পট দিল শহর ছেড়ে।

মার্কনি সাহেবের বয়স তখন মাত্র আঠারো। বেতারে প্রথমে শুধু টরে-টক্কা পাঠিয়ে অনেক পরে তিনি জগদ্বিখ্যাত হলেন রেডিও আবিষ্কারক হিসেবে। কিন্তু গান-বাজনা কথাবার্তা বেতারে প্রেরণ এবং গ্রহণ করার মত বেতার-যন্ত্র আবিষ্কার করেও অনামী রয়ে গেল নাথন স্টাবলফিল্ড।

বেচারী! পেশায় সে টেলিফোন মিস্ত্রী। উপরি রোজগার করত ক্যালোওয়ের একটা খামার বাড়িতে গতর খাটিয়ে। বেতার কী বস্তু, নাথনই সর্বপ্রথম দেখাল সবাইকে। ইতিহাসে তার নাম উঠল না—উঠল মার্কনি সাহেবের। শুধু তাই নয়। আদি আবিষ্কারকের বরাতে জুটল টিটকিরি এবং শহর থেকে বিতাড়ন।

কিন্তু এমন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা একেবারেই ধামাচাপা পড়তে পারে না। অনেক বছর পরে লোক-মুখে খবর গিয়ে পৌঁছল একটা খবরের কাগজের দপ্তরে। সেণ্ট লুই পোস্ট ডেসপ্যাচ থেকে তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে চিঠি লেখা হলো নাথনকে—আবিষ্কারটা তাদের সামনে একবার দেখানো হোক। জবাব এল কয়েক সপ্তাহ পরে। সংক্ষিপ্ত জবাব। নাথন লিখেছে ঃ

'আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ। যে কোন দিন চলে আসুন আমার আস্তানায়। নাথন স্টাবলফিল্ড, আবিষ্কারক।'

পোস্ট ডেসপ্যাচের সংবাদদাতা নাথনের ক্ষুদে খামারবাড়িতে পা দিল ১৯০২ সালের ১০ই জানুয়ারী। নাথন তার হাতে ধরিয়ে দিল একটা টেলিফোন আর টেলিফোন-সংলগ্ন ফুট চারেক লম্বা একজোড়া ইস্পাতের শিক। বলল—"যে-দিকে দু চোখ যায় চলে যান। যেখানে খুশী শিক দুটো মাটিতে গেঁথে দিন। টেলিফোন কানে লাগান। আমার কথা শুনতে পাবেন।"

খবরের কাগজে ফলাও করে খবরটা ছাপা হয়েছিল যথাসময়ে। রিপোর্টার ভদ্র-লোক লিখেছিলেন—"অবাক কাণ্ড! মাইলখানেক দূরে গিয়ে ইস্পাতের শিকদুটো মাটিতে গেঁথে টেলিফোন কানে লাগাতেই নাথন স্টাবলফিল্ডের গলা শুনলাম। এমন স্পষ্ট শুনলাম যেন ঘরের ও-দিক থেকে কথা বলছে নাথন!"

কিন্তু এমন একটা অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হল কি করে? নাথন বললে—"অতি সহজে। জল, মাটি, বাতাস জুড়ে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড বিরাজ করছে, আমি শুধু তাকেই কাজে লাগাচ্ছি। এমন একদিন আসবে যেদিন রাজধানীর ভাষণ কেনটাকিতে বসে শোনা যাবে। পৃথিবীর এক অঞ্চলের গান-বাজনা আরেক অঞ্চলে নিমেষে পৌঁছোবে।"

কাগজের খবর পড়ে টনক নড়ল ফিলাডেলফিয়ার ধনকুবেরদের। আবিষ্কারটা কিনে নিয়ে দু'পয়সা পেটবার লোভে তাঁরা মহাসমাদরে নেমন্তন্ন করে আনলেন কেনটাকির অখ্যাত টেলিফোন মিস্ত্রী নাথনকে। নাথন ফিলাডেলফিয়ায় এল ১৯০২ সালের মে মাসে এবং বেতার-ভেল্‌কি দেখিয়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিল টাকার কুমীরদের। সেখান থেকে গেল ওয়াশিংটন ডি-সি'তে। সেখানের ঘটল এক কাণ্ড—চোখ কপালে উঠল বৈজ্ঞানিকদের।

কাগজে খবর পড়ে টনক নড়ল ধনকুবেরদের।

সামান্য একটা মিস্ত্রীর এত নামডাক অনেকেরই সইল না। তাছাড়া মার্কনি স্বয়ং যেখানে টরে-টক্কা জাতীয় ফুটকি ছাড়া বেতারে কিছুই পাঠাতে পারেন নি, সেখানে নাথন একেবারেই গানবাজনা কথাবার্তার বেতার আবিষ্কার করে সুনাম কিনছে দেখে চোখ টাটাল অনেকের। সুতরাং জোর চেষ্টা চলল বেচারাকে ল্যাজেগোবরে করার।

তাই বার্থলডি নামে একটা স্টীমে চলা জাহাজে বসানো হল নাথনের বেতার-যন্ত্র। খানদানী ব্যক্তিরা পোটোম্যাকের ভার্জিনিয়া উপকূল বরাবর দাঁড়িয়ে গেল টেলিফোন হাতে। জাহাজ চলতেই ইস্পাতের রডদুটো মাটিতে পুঁতে কান দিল টেলিফোনে।

এবং স্পষ্ট শুনল নাথনের কথা। জবাব দিল। জাহাজে বসে তা শোনা গেল অতি স্পষ্ট।

২১শে মে, ১৯০২ তারিখে ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার পত্রিকায় হেডলাইন ছাপা হল মোটামোটা অক্ষরে ঃ

এই প্রথম হাতেনাতে দেখান হল
ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফির ব্যবহারবিধি
আধ মাইল দূর থেকেও শোনা গেল স্পষ্ট···
কেনটাকি কৃষকের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার···
বেতার টেলিফোন সন্দেহাতীতভাবে প্রদর্শিত।

প্রশংসা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল নাথনের। ধনকুবেরদের খোশামুদে ঠেলায় ভড়কেও গেল বিলক্ষণ। তাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে চম্পট দিল দিন কয়েকের মধ্যেই।

দিন যায়, বেতারে কণ্ঠস্বর প্রেরণ করার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলল অনেকে। নাথনের কানে সে-খবর পৌঁছোতে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সে। পাছে তার আবিষ্কার খোয়া যায়, এই ভয়ে পালিয়ে এসেও রেহাই নেই। নিশ্চয় ফাঁস হয়ে গিয়েছে ওর গুপ্ত রহস্য। নইলে অনেকের পক্ষে বেতারে কথা বলা সম্ভব হয় কী করে?

মনে মনে গুমড়ে আর কদ্দিন থাকা যায়। ১৯২৯ সালে শেষ হয়ে গেল সব যন্ত্রণা। ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে পাওয়া গেল নাথনের নিষ্প্রাণ দেহ।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তার সেই পরমাশ্চর্য বেতার-যন্ত্রর হদিস মিলল না। আশ্চর্য কল যেন আশ্চর্যভাবেই উবে গেছে ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে থেকে।

কেনটাকির মুরেতে ইতিহাস রচনা করেছিল নাথন ১৮৯২ সালে। বেতার ভাষণ শুনিয়েছিল আদালত প্রাঙ্গণে। আজও সেখানে দেখা যায় পাথরের একটা স্মৃতি-ফলক। পাগল দুর্নাম নিয়ে বিতাড়িত হওয়ার সময়ে বলে গিয়েছিল নাথন—"আরো পঞ্চাশ বছর পরে জন্মালেই কদর পেতাম। মাটি করলাম পঞ্চাশ বছর আগে জন্মে।"

পঞ্চাশ বছর পরে যা যা ঘটবে, নাথনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু সত্য হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে।

আশ্চর্যের কথা—

পোলিও মাইলেটিস রোগে শিশুরা একবার আক্রান্ত হলে তাদের অধিকাংশকেই প্রায়ই চিররুগ্ন হয়ে থাকতে হত। রোগ সারাবার কোন অষুধই ডাক্তাররা জানতো না। তাই যাতে রোগ না হয় তার গবেষণা করে দুজন ডাক্তার জোনা সল্ক ও আলবার্ট সেবিন পোলিও ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন। ১৯৫২ সালে শুধু আমেরিকাতেই ৫৭৮৭৯ জন ছেলেমেয়ে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়। এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করে ১৯৬৪ সালে রুগীর সংখ্যা কমতে কমতে ১২১তে এসে দাঁড়িয়েছিল। সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই, যে মানুষ লোককে বাঁচবার জন্যে নানারকম অষুধ আবিষ্কার করছে সেই মানুষই মানুষ মারার ভয়াবহ অস্ত্রও আবিষ্কার করে চলেছে।

অমর বীর কাহিনী

শ্রেষ্ঠ মৌর্য শতংধনুঃ

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

বেরার? বেরার? বেরারও?

মৌর্যসম্রাটের কণ্ঠ থেকে একটা আর্তনাদই বেরুলো বুঝি। বেরারে বিদ্রোহ ঘটেছে। চন্দ্রগুপ্ত অশোকের স্মৃতিপূত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা আজ তারা গ্লানিকর বলে বিবেচনা করল। হাসি পায়, দুঃখ হয়, কিন্তু সবচেয়ে যা জুড়ে বসে মনটাকে, তা হল গভীর নৈরাশ্য। বলতে গেলে পাটলিপুত্র রাজধানীর দ্বার প্রান্তেই যে বেরারের অবস্থান! সে যদি স্বতন্ত্র্য কামনা করে, তাহলে মৌর্যবংশের আর সাম্রাজ্য বলে অবশিষ্ট কী থাকে?

কাশ্মীর গিয়েছে অর্ধশতাব্দী আগে, কলিঙ্গ তারও আগে। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো একটার পরে একটা করে সম্পর্ক ছেদ করেছে, তা সম্রাট শতংধনুর পরিষ্কার হিসাবই নেই। বস্তুতঃ পাটলিপুত্রের চারপাশে যে-ভূখণ্ডটা আজ মৌর্যবংশের অধিকারের ভিতরে আছে, সাম্রাজ্য না বলে তাকে একটা নাতিবৃহৎ রাজ্য আখ্যাই দেওয়া উচিত।

ক্ষোভ রোষের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, প্রশ্নটা এখন জীবনমরণের সমস্যায় এসে দাঁড়াল যে! সম্রাট মন্ত্রণাসভার অধিবেশন ডাকলেন একটা। মন্ত্রীরা কী বলেন? কী বলেন সেনাপতিরা? কর্তব্য স্থির করার আগে হিতৈষীদের পরামর্শ নেওয়া কর্তব্য মনে হল সম্রাটের।

প্রধান মন্ত্রী বললেন—"ধনৈশ্বর্য বলুন, স্বাস্থ্যসুখ বলুন, ধরণীতে সবই অনিত্য। জীবের মত প্রতিষ্ঠানও কালধর্মের বশীভূত। জন্ম, বৃদ্ধি, লয়, সকলকেই এই ত্রিদশার ভিতর দিয়ে

অগ্রসর হতে হয়। এ-সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত প্রিয়দর্শন। পর্যায়ে পর্যায়ে তার বৃদ্ধি হয়েছিল অমিত্রঘাত বিন্দুসার ও ধর্মাশোক প্রিয়দর্শীর শাসনকালে। তার পর থেকেই শুরু হয়েছে লয়ের যুগ। ধাপে ধাপে শক্তিক্ষয় ঘটেছে। একদিন যে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাতে সন্দেহ কী? আমাদের কাজ আমরা করছি, করে যাব। যেমন নাকি চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে থাকেন, রোগীর মরণ আসন্ন জেনেও। সম্রাট মহাকালের ইঙ্গিত উপলব্ধি করুন, মনে শান্তি পাবেন। মিথিলাকে দগ্ধ হতে দেখে জনক রাজা শুধু বলেছিলেন—"মিথিলায়াং প্রণষ্টায়াং ন মে নশ্যতি-কিঞ্চন।"

সম্রাট্ যে মহাকালের ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারেন নি এখনো, তাঁর হাবভাবেই তা সুস্পষ্ট। চোখ লাল। কপালে ভ্রূকুটি, নাসা স্ফুরিত। তিনি যে মর্মান্তিক রেগে গিয়েছেন মন্ত্রীর কথা শুনে, এ আর বুঝতে বাকী নেই কারও।

অন্য মন্ত্রীরা কেউ কোন কথা কইছেন না দেখে সম্রাট প্রধান সেনাপতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ভদ্রলোক এখন প্রবীণ, বয়সকালে অনেক যুদ্ধই করেছেন। পঞ্চনদে, মালবে, থানেশ্বরে, কোথায় নয়? এমন কি, বিন্ধ্য পেরিয়ে গাহড়বালদেরও দেশে একবার হানা দিতে হয়েছিল সৈন্য নিয়ে। শেষ দিকে সর্বত্রই পরাজয় স্বীকার করে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর নিজের সৈন্যাপত্যের দৈন্যের দরুন নয়। নিয়তিই যেন প্রতি রণক্ষেত্রে বিরূপ ছিল তাঁর উপরে। করায়ত্ত জয় ফসকে গিয়েছে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে। শেষবার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—"যুদ্ধজয়ের প্রতিভা আর মৌর্যবংশে কারও নেই। সে প্রতিভা ছিল এ-বংশের প্রথম তিন সম্রাটের। কলিঙ্গজয়ের পরে মহামতি অশোক স্বেচ্ছায় তাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করে। সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করে গিয়েছেন তিনিই। বিরাট সাম্রাজ্যসৌধের পাথর এক একখানা খসে পড়ছে সেই থেকেই। আজ আর একে চাড়া দিয়ে খাড়া রাখবার উপায় নেই কিছু।"

এ কথা সেনাপতি চন্দ্রশেখর বলেছিলেন বিশ বৎসর পূর্বে। তারপর থেকে নিজে আর কোন যুদ্ধে তিনি যাননি। সৈন্য পাঠাবার দরকার হলে সহকারী পুষ্যমিত্রকেই পাঠিয়েছেন। পুষ্যমিত্র গিয়েছেন এবং যথারীতি হেরে ফিরে এসেছেন। সেনাপতি অনেকবার চেয়েছেন অবসর নিতে, সম্রাটেরাই দেননি। সম্রাটেরা মানে—বর্তমানের এই শতংধনু এবং তাঁর পূর্ববর্তী দেবগুপ্ত।

যা হোক, আজ শতংধনু যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে নীরব প্রশ্নে জানতে চাইলেন তাঁর পরামর্শ, তিনি পশ্চাতে উপবিষ্ট সহকারীকে উদ্দেশ করে বললেন—"বল হে পুষ্যমিত্র। আমাদের পক্ষ থেকে যা নিবেদন করবার আছে, তা নিবেদন কর প্রভুর কাছে। যুদ্ধে যেতে হলে তুমিই ত যাবে, সুতরাং যা বলবার, তোমার বলাই ভাল।"

এই কথা বলে বৃদ্ধ সেনাপতি পাশের দিকে সরে গেলেন একটু, সহকারী সেনাপতি পুষ্যমিত্র এতক্ষণ ছিলেন একেবারে আড়ালে। এইবারে তাঁর মুখমণ্ডল দৃষ্টি-পথে পতিত হল সম্রাটের এবং সভাজনের, সে-মুখ এক রুক্ষ ক্রোধন প্রৌঢ় সৈনিকের। অকালে বলি-রেখায় বন্ধুর ললাট, নির্মম দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় রক্তাভ নেত্রকোণ, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠের উপরে জমকালো একজোড়া কুচকুচে কালো গোঁফ।

পুষ্যমিত্র সংক্ষেপে বললেন—"আমায় যদি বলতে বলেন, আমি বলব, যুদ্ধ করাই উচিত।"

মন্তব্যটা এল সম্রাটের কাছ থেকে—"করা যে উচিত, তাতে আমারও সন্দেহ নেই। কিন্তু কী জন্য তুমি ওটাকে উচিত বলছ, সেটা জানতে চাই। সেনাপতি ত বলেন—যুদ্ধজয়ের প্রতিভাই নেই আর আমাদের। তা যদি না থাকে, পরাজয় যদি হয় অনিবার্য, তা হলে, সব জেনেও তুমি যুদ্ধের পরামর্শ দিচ্ছ কেন ?''

"যদি সম্রাট ক্রুদ্ধ না হন, আমি প্রার্থনা করব যে সে-কারণ ব্যক্ত করার দায় থেকে এ দাসকে অব্যাহতি দেওয়া হোক—"

মন্ত্রণাসভা স্তব্ধ। এ আবার কী-রকম উত্তর ? যুদ্ধ করা বা না-করা, এটা রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন। রাষ্ট্র মানেই সম্রাট। প্রধানতঃ তাঁরই স্বার্থ রক্ষার দিকে লক্ষ্য থাকে মন্ত্রণাসভার, যখন সন্ধি বা বিগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় কিছু। পুষ্যমিত্র যখন যুদ্ধ করা উচিত বলেছেন, তখন তা সম্রাটের স্বার্থের অনুকূল হবে—জেনেই বলেছেন অবশ্য। তবে সম্রাটকেই তা জানানোর পক্ষে বাধা কী থাকতে পারে ?

যা হোক, সম্রাট এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। কিন্তু মনে মনে যে খুবই অপ্রসন্ন হয়েছেন তিনি, তা বুঝতেও বাকী রইল না কারও।

আদেশ প্রচার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে—বিদর্ভ-রাজধানীর দিকে সামরিক অভিযান বেরুবে অচিরে। প্রস্তুতিপর্বে সময় গেল প্রায় পক্ষ কাল। তারপর তোড়জোড় যখন সম্পূর্ণ, শতংধনু সকালবেলায় নগর ভ্রমণে বেরিয়ে যেন আকস্মিক খেয়ালের বশেই গিয়ে দেখা দিলেন সেনাপতি চন্দ্রশেখরের গৃহে। বৃদ্ধ তখন গৃহদেবতার পূজা সাঙ্গ করে সবে দেবগৃহের সোপানে পা দিয়েছেন, সমুখে রাজাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন একেবারে—

"এ কী! এ কী পরম ভাগ্যোদয়!"—বাক্‌স্ফূর্তির প্রথম উচ্ছ্বাস এইভাবে ব্যক্ত হল সেনাপতির মুখ থেকে।

রাজা পাদুকা খুলে রেখে মন্দিরে উঠলেন, দ্বারদেশেই নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন পদ্মাসন বুদ্ধমূর্তিকে। শাক্যমুনির নানাবিধ মূর্তি তখনই পূজিত হতে শুরু করেছে। ভারতে বরং কম, বহির্ভারতীয় দেশসমূহেই বেশী।

প্রণামান্তে সেই সোপানেই বসলেন শতংধনুঃ এবং চন্দ্রশেখরকে মৃদু আকর্ষণে টেনে বসালেন নিজের পাশে। "সম্রাট! সম্রাট! এ যে ধৃষ্টতা হচ্ছে আমার পক্ষে! আমার স্থান ত আপনার পায়ের তলায়—"

"কিছু না! কিছু না! একটু নিভৃত পরামর্শ করা দরকার আপনার সঙ্গে। মন্ত্রণা-সভাও ডাকব না, নিভৃত বিশ্রামকক্ষেও আহ্বান করব না আপনাকে। লোকের কৌতূহল বাড়িয়ে লাভ কী?"

"বুঝেছি। আদেশ করুন তাহলে—" বললেন সেনাপতি।

"যুদ্ধে পুষ্যমিত্রকে একা পাঠাবেন না। নিজে চলুন আপনি, আপনার সহকারীর অবশ্য প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই, সে কাজটা আমাকেই দিন—"

"সম্রাট?"—এর বেশী আর কোন কথা বেরুলো না বৃদ্ধের মুখ থেকে।

"ও সেদিন কী কথা বলতে চায় নি, তা কি আপনি বুঝতে পারেন নি আর্য?"

"না প্রভু! আমি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। বুঝতাম না বলাই সংগত হবে, কারণ এ-বয়সে যুদ্ধও আর বুঝি না বোধ হয়।"

সম্রাট হাসলেন—"আপনার তরোয়ালের মতই সরলরেখায় ধাবিত হয় আপনার বুদ্ধি। কিন্তু সব যুদ্ধ-ব্যবসায়ীই সরল নয়, দৃষ্টান্ত বন্ধু পুষ্যমিত্র। শুনুন, আপনি ত জানেন, ও আমাদের বংশের লোক নয়, জাত্যংশে ও সুঙ্গ। কেউ কেউ বৈন্ধিকও বলে। বর্ণে ব্রাহ্মণ, অথচ কাজ করে ক্ষত্রিয়ের। বিশ্বামিত্রের উলটো পথে চলেছে, কিন্তু লক্ষ্য এক, শক্তি-লাভ। তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ হতে। ইনি চান সম্রাট হতে।"

"সে কী?"—সেনাপতি যেন পাথর বনে যাচ্ছেন।

"যুদ্ধের পরামর্শ দিচ্ছেন, পরাজয় অনিবার্য মনে করেও। তার অর্থ এই যে—সাম্রাজ্যের যেটুকু বা সামরিক শক্তি এখনও আছে, উনি চান যে এই যুদ্ধেই তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাক—"

"তাহলেই পুষ্যমিত্র চড়ে বসতে পারবেন মগধ সিংহাসনে?"—সম্রাটের কথায় অবিশ্বাস এবং পুষ্যমিত্রের সম্ভাব্য ঘৃণ্য আচরণের উদ্দেশে গভীর বিতৃষ্ণা, দুটো সমভাবে মিশে আছে সেনাপতির কথায়।

"শুনুন, পুষ্যমিত্র অবশ্যই যাবে আমাদের সঙ্গে, তাকে পিছনে রেখে যাওয়াও তো বিপজ্জনক! ও যাবে, কিন্তু কোন কাজে কর্তৃত্ব পাবে না। অথচ এমন কৌশলে ওকে দাবিয়ে রাখতে হবে যাতে কৌশলের গন্ধও আদৌ না পায়। অর্থাৎ, যা আমরা ঘটাব—তা যেন আপনা থেকেই ঘটে যাচ্ছে—এমনি একটা আকার দিতে হবে পরিস্থিতিটার।"

সেনাপতি মাথা নাড়লেন অতি ধীরে, তারপর বললেন—"যে জিনিসের যে আকার

নয়, তাকে সে আকার দেওয়ার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমার থাকত যদি, আমি সম্রাটের মন্ত্রী হতাম, সেনাপতি না হয়ে। যা হোক, পুষ্যমিত্র সম্পর্কে সম্রাট যে চিন্তা করেছেন, তা বোধ হয় ভিত্তিহীন নয়। উচ্চাশা ওর আছে। আমায় যা করতে বলেন, এ বৃদ্ধ বয়সেও তা করব। তার জন্য আপনাকে পরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয় যেন, এইটিই ভগবান বুদ্ধের পায়ে আমার মিনতি।"

অর্ধ দণ্ড? তার বেশী লাগে নি এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়। সম্রাট তার পরেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন সেনাপতির গৃহ থেকে। অশ্ব দাঁড়িয়ে আছে রাজপথে, হেঁটে গিয়ে তাতে আরোহণ করলেন, সঙ্গী দেহরক্ষী চতুষ্টয়ের দু'জন ঘোড়া চালিয়ে দিল সম্রাটের আগে আগে, বাকী দু'জন পিছনে পিছনে—

সেই দিনই প্রকাশ্য রাজসভায় সম্রাট ঘোষণা করলেন যে যুদ্ধের প্রথম দিকটায় তিনি নিজেও থাকবেন বাহিনীর সাথে সাথে। সবাই অবাক্। গত এক শতাব্দীর ভিতর কোন মৌর্য সম্রাট যে সশরীরে রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন, এমন কথা প্রবীণতম মন্ত্রীরাও চেষ্টা করে স্মরণ করতে পারলেন না।

আদেশ শুনে পুষ্যমিত্রের কুঞ্চিত ভ্রূ যে অষ্টাবক্র হয়ে গেল একেবারে, তা লক্ষ্য করলেন একমাত্র সেনাপতি চন্দ্রশেখর, তিনি তার পাশেই বসেছিলেন।

সেনাপতি তাঁরই দিকে চেয়ে আছেন দেখে পুষ্যমিত্র মৃদুস্বরে বললেন—"তাহলে যুদ্ধে এবার আমরা জিততেও পারি।"

সেনাপতি সত্য কথাই বলেছিলেন। কিছুই বোঝেন না, যুদ্ধ ছাড়া। পুষ্যমিত্রের কথা শুনেও বুঝতে পারলেন না যে কথাটা ব্যঙ্গ কিনা। বলা বাহুল্য, ও প্রসঙ্গে বাদানুবাদ চালিয়ে যাওয়ার মত স্থান বা কাল ওটা নয়।

নির্দিষ্ট দিনে মাগধী বাহিনীর অভিযান শুরু হল। পুষ্যমিত্র পুরোভাগে, সেনা মধ্যস্থলে সেনাপতি চন্দ্রশেখর, সর্বপশ্চাতে সম্রাট শতংধনুঃ। অন্য পাঁচটা সেনানায়কের মত সম্রাটও অশ্বারোহণেই চলেছেন, এখানে তাঁর স্বতন্ত্র দেহরক্ষী কেউ নেই। "এরা সবাই তো আমার রক্ষী। আমারও, সাম্রাজ্যেরও। চিহ্নিত করা দেহরক্ষীর প্রয়োজন কী এখানে?"

এগিয়ে চলল মাগধী সেনা। যতই দুর্দিন হোক সাম্রাজ্যের, এ অভিযান একটা দেখবার মত বস্তু। আগে আগে শ্রমিকবাহিনী, কোদাল এবং কুঠার কাঁধে। পথে কোন বাধা যদি থাকে, প্রশস্ত খাল বা উত্তুঙ্গ পাহাড়, সেখানে ওরা হাতাহাতি রাস্তা বানিয়ে ফেলবে কাজ চলবার মত।

শ্রমিকবাহিনীর পিঠেপিঠেই গজবাহিনী। শ্রমিকেরা আক্রান্ত হলে গজারূঢ় তীরন্দাজেরা রক্ষা করবে তাদের। আরোহীরা করবে শরপ্রহার, বাহনেরা করবে শুণ্ডপ্রহার।

হাতীর পিছনে ঘোড়া। অশ্বারোহী সেনা এভাবে অগ্রসর হয়, যেন প্রয়োজন হলে ডাইনে বাঁয়ে পাশ কাটিয়ে তারা হাতীদের আগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

সবশেষে পদাতিক বাহিনী। সবে মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার সৈনিক। শ্রমিক ও ভৃত্যবাহিনী মিলিয়ে আরও হাজার পাঁচেক। ভৃত্যদের মধ্যে আছে রসদবাহী, শিবির-স্থাপক, পরিচারক, পাচক, রজক, ক্ষৌরকার—কী নয়?

বেরারের সীমান্তে পৌঁছোতে এক পক্ষ কেটে গেল। বিদর্ভ রাজধানী এখান থেকে আরও তিন চারদিনের পথ। অবশ্য পথ আর এখন নেই কোথাও, বিদ্রোহীরা সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে বড় বড় খাল কেটে, আর সেই খালেরই মাটি স্তূপাকার করে টিলা বানিয়ে বানিয়ে। সুতরাং খাল বুজিয়ে, টিলা ধ্বসিয়ে দিয়ে অগ্রসর হওয়া সময়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল সম্রাট-সেনার পক্ষে।

যথাসম্ভব দ্রুত পথ তৈরি করে যাচ্ছে শ্রমিকেরা, তবে যোদ্ধবাহিনীকে মাঝে মাঝেই যাত্রা বন্ধ করে শিবিরে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে, কখনও বা দু'দণ্ড, কখনও বা পুরো দিনটারই জন্য। আশেপাশে ঘন বন, হিংস্র শ্বাপদের প্রাচুর্য তেমন নেই তাতে, কিন্তু নানা জাতীয় হরিণ অজস্র। সম্রাট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—দীর্ঘ বিশ্রামের সময় ঐসব বনে তিনি মৃগয়া করবেন।

মত চেয়ে পাঠানো হল সেনাপতির। বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর ছিলেন অশ্বারোহী সেনার মাঝখানে প্রায় আধক্রোশ ব্যবধানে। খবর পেয়েই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলেন—"সম্রাট। না গেলেই ভাল হয়, নিতান্ত যদি যান সঙ্গে সহস্র সৈনিক নিয়ে যাবেন অন্ততঃ। তারা বৃত্ত রচনা করে থাকবে আপনার চারদিকে, তীরের পাল্লার চাইতে সে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেন দীর্ঘতর হয়।"

সম্রাট হেসে বললেন—"তাই হবে"—

সেনাপতি সহস্রনায়ক ভদ্রসেনকে আহ্বান করে বলে দিলেন—"যখনই সম্রাট শিকারে বেরুবেন, তুমি তোমার হাজার পদাতিক নিয়ে—"

বৃত্ত রচনার ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের স্থানে। শ্রমিকেরা ইতিমধ্যে খানিকটা পথ পরিষ্কার করে ফেলেছে, ততটা ত এগিয়ে যাওয়া যাক! আজ আর সম্রাটের শিকারে যাওয়া হল না।

কিন্তু পরের দিনই হল। আজ অন্ততঃ এক প্রহর সময় নেবে শ্রমিকেরা। একটা বিরাট খাল কেটে রেখেছে বিদ্রোহীরা, বড় বড় গাছ কেটে তার উপর ফেলতে হবে, তবে সেই সাঁকোর উপর দিয়ে পদাতিক আর অশ্বারোহীদের অগ্রগতি সম্ভব হতে

পারে। হাতী উঠতে পারবে না তার উপর, তাদের জন্য খালের দুই পাড় কেটে ঢ করে দিতে হবে, জলধারাট তারা অবশ্য সাঁতরেই পেরুবে

সম্রাট বে রি য়ে ছে ন অতএব। নিশ্চিন্ত হয়েই বেরিয়েছেন যে অন্ততঃ একটা প্রহর তিনি সময় পাবেন সাধ মিটিয়ে মৃগয়া করতে। সঙ্গে সহস্র পদাতিকসহ ভদ্রসেন, সম্রাটের চারদিকে একটা চলমান বৃত্ত রচনা করেছে তারা, লক্ষ্য রেখেছে সব ঝোপঝাড়ের উপর, সব বড় গাছের ডালপালার উপর।

ব্যাপার দেখে সম্রাট বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এভাবে শিকার চলে না। হাজার লোকের দৌড়ঝাঁপ চলছে, কোন্ ভরসায় ব ন্য জ ন্তু রা থাকবে সেখানে ?

শতংধনুঃর ধনুক টঙ্কার দিয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে— [পৃষ্ঠা ৩৪৬

হাতে তীর ধনুক। শিকার যা কিছু, এই অস্ত্র দিয়েই হবে। ভল্ল চলে অল্প দূরে। তরোয়াল চলে হাতের নাগালের ভিতরে। দূরের লক্ষ্য ভেদ করার ব্যাপারে—

তীর ধনুক হাতে নিয়ে হতাশ নয়নে চারিদিকে তাকাচ্ছেন সম্রাট। কোথাও একটা শেয়ালও নেই। সব পালিয়েছে। সম্রাট মরিয়া হয়ে ভাবলেন—একটা পাখী মারতে পারলেও যে হাতের সুখ হত একটু। সব গাছের মাথার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুলিয়ে আনছেন তিনি।

সম্রাটের নাম শতংধনুঃ। শৈশবে কিন্তু নাম ছিল অন্য কিছু। কী তা সম্রাটেরও ঠিক মনে নেই। এ নাম তাঁর অস্ত্রগুরুর কাছ থেকে পাওয়া, ধনুর্বিদ্যায় তাঁর অতুলনীয়

দক্ষতার জন্য। গুরু বলতেন, গাণ্ডীবী অর্জুনের পরে এমন ধানুকী আর ভূভারতে জন্মায়নি। যেমন তীক্ষ্ণ তাঁর শ্যেন দৃষ্টি, তেমনি ক্ষিপ্র তাঁর শরসন্ধান, আর ততোধিক অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্যভেদ।

গাছের মাথার দিকে তাকাতে গিয়েই সম্রাটের দৃষ্টিপথে পতিত হল সুদূরের এক বৃক্ষ-চূড়ায় মৃদু আন্দোলন উঠেছে একটা। সৈন্যবৃত্তের বাইরে সে-স্থান, সাধারণ তীরন্দাজের তীরের পাল্লার বাইরে। কিন্তু শতংধনুঃ সাধারণ তীরন্দাজ নন, তাঁর ধনুক টঙ্কার দিয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে—

না, পাখী নয়, বানর নয়, অন্য কোন কিছু নয়, চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল একটা মানুষ। সৈনিকেরা দৌড়ে গেল। ধরে তুলল লোকটাকে। নিয়ে এল সম্রাটের কাছে। কিছুসংখ্যক সাবধানে লক্ষ্য করতে লাগল, অন্য কোন গাছে অন্য কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।

মৃতদেহটা পরীক্ষা করে মূল্যবান যা পাওয়া গেল, তা একখণ্ড লিখন—"বনের ভিতর—শিকারী শিকার—গাছের উপর থেকে—"

মৃগয়া বন্ধ করে সম্রাট শিবিরে ফিরে এলেন, সেনাপতিকে ডেকে এনে নিভৃতে লিখনটুকু দেখালেন তাঁকে। বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর চমকে উঠলেন—"সম্রাট! সম্রাট! এ হস্তাক্ষর চেনা-চেনা লাগছে যে!"

তিনি তক্ষুণি দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠালেন কয়েকজন, পুষ্যমিত্রকে ডেকে আনতে।

তারা ফিরে এল। পুষ্যমিত্র নেই শিবিরে। অল্পক্ষণ আগেই তিনি ঘোড়ায় চড়ে একাকী চলে গিয়েছেন, শ্রমিকবাহিনীর সমুখ দিয়ে, বিদর্ভের দিকে। কেউ কেউ তাঁকে একা যেতে নিষেধ করেছিল সবিনয়ে, তিনি গ্রাহ্য করেন নি সে-কথা।

এর পরও কি কিছু বুঝতে বাকী থাকে?

পুষ্যমিত্র বিশ্বাসঘাতক। এইজন্যই কোন যুদ্ধে মৌর্যরাজশক্তি আজকাল আর জয়লাভ করে না। বিদর্ভের সঙ্গে চক্রান্ত চলছিল তাঁর আগে থেকেই। সম্রাটকে অপসারিত করবার। এ-প্রয়াস সফল হলে অবশ্যই পরবর্তী শিকার হতেন সেনাপতি, এবং তারপরই সম্রাটবাহিনী অভিযান বন্ধ রেখে ফিরে যেত পাটলিপুত্রে। পুষ্যমিত্রের জন্য সিংহাসন অধিকার করতে।

যাক। রক্ষা করেছেন ভগবান বুদ্ধ। বাহিনী অগ্রসর হল শত্রুদমনের জন্য। কিন্তু বেরার আর যুদ্ধ চায় না। সম্রাট আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই বেরার থেকে ছুটে এল বিদ্রোহী রাজা নরসিংহের দূত। "সন্ধি! সন্ধি! বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করছি! ক্ষমা করুন এবারকার মত।"

মহান অশোকের বংশধর শরণাগতকে পীড়ন করতে পারেন না। সন্ধি অবশ্যই হবে। কিন্তু পুষ্যমিত্রের সঙ্গে বেরারের কী ষড়যন্ত্র হয়েছিল। সেটা জানতে চান সম্রাট।

পুষ্যমিত্র ? বেরারীরা কোন পুষ্যমিত্রকে চেনে না, কোন ষড়যন্ত্র তারা করেনি। তারা যোদ্ধা, গুপ্তঘাতক নয়, ষড়যন্ত্র যদি হয়ে থাকে, সেটা পুষ্যমিত্রই করেছে, তার নিজের অনুগত লোকদের নিয়ে।

তা হতেও পারে হয়ত। বেরারের বিরুদ্ধে প্রমাণ ত কিছু নেই। অতএব সন্ধি হয়ে গেল। রাজা নরসিংহ নিজে এসে দেখা করলেন সম্রাটের সঙ্গে। নানা উপহার, রাজকরের প্রতিশ্রুতি। এমন কি, সবিনয় প্রার্থনা—নরসিংহের অনূঢ়া ভগ্নী বিদ্যুৎবর্ণাকে বিবাহ করুন সম্রাট।

নতুন রানী বিদ্যুৎবর্ণাকে দেখলেন মহিমাংর। [পৃষ্ঠা ৩৪৮

এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে অপমান করা হয় সমগ্র বেরারীকে। কাজেই সম্মত হতে হল সম্রাটকে। তিনি বিদর্ভ রাজধানীতে চললেন বিবাহ করবার জন্য। অসাধারণ রূপসী ঐ রাজকন্যা। বিদ্যুতের মত চোখ-ঝলসানো দীপ্তি তার দেহে। বিবাহ করে সম্রাট ফিরে গেলেন পাটলিপুত্রে।

পুষ্যমিত্র ? বহু সন্ধানে জানা গেল—সে চলে গিয়েছে কাশ্মীরে। সেখানে তার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে রাজপুত্র বৃহদ্রথের সঙ্গে।

কী দুর্গ্রহ ! এই বৃহদ্রথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শতধনুর। অগ্রজের সিংহাসনপ্রাপ্তি তিনি খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন নি, আজ কয়েক বৎসর থেকেই বাস করছেন কাশ্মীরে

রাজ-অতিথিরূপে। কাশ্মীররাজ জয়বর্ধনও মৌর্যবংশধর। পঞ্চাশ বৎসর আগেও কাশ্মীর মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন স্বাধীন এবং সন্ধিসূত্রে মগধ সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাবও রয়েছে প্রচুর।

সে যাই হোক, বৃহদ্রথ ঐ কুচক্রী পুষ্যমিত্রের ফাঁদে পা দিয়েছে যখন, তখন তার ভাগ্যে দুঃখ আছে। সম্রাট একটা চিঠি লিখলেন জ্ঞাতি ভ্রাতা জয়বর্ধনের কাছে বৃহদ্রথকে সতর্ক করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে।

কিন্তু এ আবার কী হল? সম্রাটের স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়েছে যে! কী ব্যধি, রাজভিষক্ ধরতে পারছেন না। কাশী থেকে বৈদ্যরাজ মহিমাধরকে আহ্বান করা হল রোগনির্ণয়ের জন্য। তিনি এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

এ যে সুস্পষ্ট বিষপ্রয়োগের লক্ষণ!

কে দেবে বিষ? কে দেবে বিষ? সূপকার, ভৃত্য সবাইকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে মহিমাধর বললেন—"আমি সব রানীমাতাদের এক একবার দেখতে চাই!"

নতুন রানী বিদ্যুৎবর্ণাকে দেখেই তিনি টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন অন্তঃপুর থেকে, মন্ত্রীকে বললেন—"ঐ রানী বিষকন্যা। বিবাহ হয়েছে কতদিন? ছয়মাসের বেশী হল? শিবের অসাধ্য, সম্রাটকে বাঁচানো যাবে না।"*

সম্রাটকে জানানো হল একথা। নানাভাবে প্রশ্ন করে বিদ্যুৎবর্ণার কাছ থেকে চমকপ্রদ তথ্য যা জানা গেল, তা হল এই যে সে বেরার রাজের ভগ্নীই নয়, একান্ত নিঃসম্পর্কীয়া এক নারী। রাজা নরসিংহ তাকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন সম্রাটের নিধন কামনাতেই।

হয়ত এর পিছনেও পুষ্যমিত্রেরই পরামর্শ ছিল। কিন্তু থাকুক বা না থাকুক, সম্রাটের মৃত্যু হল এবং তাতে লাভবান হলেন পুষ্যমিত্রই। কারণ বৃহদ্রথ যখন সম্রাট-সিংহাসন গ্রহণের জন্য কাশ্মীর থেকে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন পুষ্যমিত্রকে। বৃদ্ধ মন্ত্রী, বৃদ্ধ সেনাপতি সবাইকে অবসর দিয়ে নবীন সম্রাট পুষ্যমিত্রকেই নিয়োগ করলেন দুটো পদেই।

বলা বাহুল্য, বৃহদ্রথকে অপসারিত করে সিংহাসন অধিকার করতে বেশীদিন লাগেনি পুষ্যমিত্রের।

---

* বিষকন্যা—শৈশব থেকেই মেয়েকে একটু একটু করে বিষ পানে অভ্যস্ত করা হত। নিয়মিত বিষ সে খেয়ে যেত যৌবন পর্যন্ত। তার তাতে কিছু ক্ষতি হত না, কিন্তু তাকে যে বিবাহ করত, তার মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী।

অনিল ভৌমিক

৩

কাশেম তক্কে তক্কে রইল। ছেলেটি তখন ঘোড়ার মুখ উল্টোদিকে ফিরিয়ে অন্য দস্যু ক'টার সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল। কাশেম যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে নীচু হয়ে ছেলেটির ঘোড়ার পেটের দিকে জিনের চামড়াটায় তরোয়াল চালাল। জিনটা কেটে দুটুকরো হয়ে গেল। ঘোড়াটাও আকস্মিক আঘাতে দু'পা শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল। ছেলেটি জিনসুদ্ধু হুড়মুড় করে গড়িয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। ঘোড়ার গা থেকে রক্ত ছিটকে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কাশেম অট্টহাসি হেসে উঠল। ওর কুৎসিত মুখটা আরো বীভৎস হয়ে উঠল। এবার অন্য দস্যুগুলো ঘোড়া নিয়ে ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু কাশেমের ইঙ্গিতে থেমে গেল।

ফ্র্যান্সিস বুঝল—কাশেমের নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক অভিসন্ধি আছে। ঠিক তাই। কাশেম নিজের ঘোড়াটাকে ছেলেটির কাছে নিয়ে গেল। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটির সর্বাঙ্গে রক্তের ছোপ। সে বেশ ক্লান্ত এটাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাশেম নীচু হয়ে তরোয়ালের ডগায় বালি তুলে ছেলেটির চোখে মুখে ছিটোতে লাগল। দস্যুদলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা ছেলেটিকে চারদিক থেকে ঘিরে মজা দেখতে লাগল। এক সময় অনেকটা বালি ছেলেটির চোখে ঢুকে পড়ল। সে বাঁ হাতে চোখ রগড়াতে লাগল। কিন্তু হাতের

তরোয়াল ফেলল না। ঠিক তখনই বালিতে প্রায় অন্ধ ছেলেটির মাথা লক্ষ্য করে কাশেম তরোয়াল তুলল। ফ্র্যান্সিস আর সহ্য করতে পারল না। বিদ্যুৎবেগে ঘোড়াটাকে কাশেমের সামনে নিয়ে এল। কাশেম কিছু বোঝবার আগেই ফ্র্যান্সিস কাশেমের উদ্যত তরোয়ালটায় আঘাত করল। আগুনের ফুলকি ছুটল যেন। কাশেমের আর তরোয়াল চালানো হল না। কিন্তু ফ্র্যান্সিস বেকায়দায় তরোয়াল চালিয়ে ছিল। তাই মুঠি আলগা হয়ে ওর তরোয়ালটা ছিটকে পড়ে গেল। কাশেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্র্যান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠল—'কাফের।' তারপরেই ছুটল ফ্র্যান্সিসের দিকে। ফ্র্যান্সিস বিপদ গুনল। কাশেম তরোয়াল উঁচিয়ে আসছে। ফ্র্যান্সিসের সাধ্য নেই খালি হাতে ওকে বাধা দেয়।

—'ফ্র্যান্সিস!' চাপা স্বরে কে ডাকল। ফ্র্যান্সিস দ্রুত ঘুরে তাকাল। ফজল! ফজল ওর তরোয়ালটা এগিয়ে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়েই ফ্র্যান্সিস কাশেমের প্রথম আঘাতটা সামলাল। কাশেম আবার তরোয়াল তুলল। ঠিক তখনই সর্দারের বজ্র-নির্ঘোষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কাশেম ভুলে যেও না আমরা লুঠ করতে এসেছি।' কাশেম উদ্যত তরবারি নামাল। শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল। অথচ উপায় নেই। সর্দারের হুকুম। কাশেম সর্দারের কাছে গেল। দু'জনে কী কথা হল। কাশেম তরোয়াল উঁচিয়ে ক্যারাভ্যানের দিকে ইঙ্গিত করল। কী হয় দেখবার জন্যে মরু-দস্যুরা এতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিল। সেই স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল তাদের চিৎকারে। সবাই চিৎকার করতে করতে ছুটল ক্যারাভ্যানের দিকে। তারপর পৈশাচিক উল্লাসে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারাভ্যানের ওপর। আবার আর্ত চিৎকার কান্নার রোল উঠল। অবাধ লুঠতরাজ চলল।

এবার ফেরার পালা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলোর ওপর দিয়েই দস্যুর দল ঘোড়া ছোটাল। ফ্র্যান্সিস অতটা অমানুষ হতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখল সেই ছেলেটি। মাটিতে হাঁটু গেড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্র্যান্সিস একবার ভাবল নেমে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু উপায় নেই। মরু-দস্যুর দল অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্র্যান্সিস দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দলের সঙ্গে এসে মিশল।

ওরা যখন সেই মরূদ্যানে ফিরে এল তখন সূর্য মাথার ওপরে। চারিদিকে বালির ওপর দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটছে যেন।

বিকেলে খেজুর গাছটার তলায় আবার ফজলের সঙ্গে দেখা হল। ফজল আনন্দে উত্তেজনায় ফ্র্যান্সিসের হাত চেপে ধরল—ভাই তুমিই আজকে অতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচালে।

—কেন ?

—তোমার কাছে বাধা পেয়েই কাশেম আর এগোতে সাহস করে নি।

—তা না হ'লে কী করতো ?

—সব ক'জনকে মেরে ফেলতো।

—সে কি ! মেয়েরা বাচ্চাগুলো ওরা তো নিরপরাধ।

—কাশেমের নিষ্ঠুরতার পরিমাপ করতে পারবে না ভাই। জাহান্নামেও ওর ঠাঁই হবে না।

—হুঁ।

—ও কিন্তু তোমাকে সহজে ছাড়বে না। সাবধানে থেকো।

—ও আমার কী করবে ?

—জানো না তো ভাই, দলের কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না, এমন কি সর্দারও না। হঠাৎ পেছনে কাকে দেখে ফজল থেমে গেল। কাশেম নয়। দস্যুদলের একজন। কাছে এসে ফ্র্যান্সিসকে ডাকল—এই ভিনদেশী—তোমাকে সর্দার এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

—চলো, ফ্র্যান্সিস উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটার পেছনে পেছনে সর্দারের তাঁবুর দিকে চলল।

একটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সর্দার রূপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিল। ফ্র্যান্সিস গিয়ে দাঁড়াতে নল থেকে মুখ না তুলে ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলল। জাজিমপাতা ফরাসের ওপর বসতে গিয়ে ফ্র্যান্সিস দেখল কাশেমও একপাশে বসে আছে। কাশেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্র্যান্সিসের দিকে একবার তাকাল, পরক্ষণেই যেন প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। এতক্ষণে সর্দার একবার কেশে নিয়ে ডাকল—ফ্র্যান্সিস।

—বলুন !

—তুমি বিদেশী—আমাদের রীতিনীতি তোমার জানবার কথা নয়। তুমি আজকে যা করেছ অন্য কেউ হলে তাকে এতক্ষণে বালিতে পুঁতে ফেলা হত।

ফ্র্যান্সিস চুপ করে রইল।

—তোমার ক্ষেত্রে অন্য রকম ব্যবস্থা নিতে হল। তারপর একটু চুপ করে থেকে ডাকল —কাশেম।

কাশেম উঠে দাঁড়াল।

—তুমি ওর সঙ্গে একা লড়তে রাজী আছ ?

কাশেম সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে একটানে তরবারিটা বের করল—এক্ষুনি।

সর্দার ফ্র্যান্সিসের দিকে তাকাল—তুমি ?

ফ্র্যান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি রাজী।

—হুঁ। সর্দার গড়গড়ার নলটা মুখে দিল। কয়েকবার টানল। তারপর বলল—রাত্তিরে তোমাকে ডেকে পাঠানো হবে। তৈরী হয়ে আসবে।

বালিতে কয়েকটা মশাল পুঁতে রাখা হয়েছে। চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মরুদস্যুদলের লোকেরা। পরিষ্কার আকাশে লক্ষ তারার ভীড়। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বালিতে ফুটফুটে চাঁদের আলো।

ফ্র্যান্সিসকে আসতে দেখে মরু-দস্যুদলের ভীড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ওরা ভীড় সরিয়ে পথ করে দিল। ফ্র্যান্সিস সহজ ভঙ্গীতে ভীড়ের মাঝখানকার ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। একদিকে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তার নীচে সর্দার বসে আছে। সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে কাশেম। হাতে খোলা তরোয়াল মশালের আলো পড়ে চক-চক করছে। মশালের আলো কাঁপছে তার টকটকে লাল আলখাল্লায়। ওকে দেখতে আরো বীভৎস লাগছে। ফ্র্যান্সিস তখনও খাপ থেকে তরোয়াল খোলেনি।

ফজলকে ডেকে সদার কী যেন বলল। ফজল কাশেমকে ফাঁকা জায়গার মাঝখানে এগিয়ে আসতে বলল! ফ্র্যান্সিসকেও ডাকল। ফ্র্যান্সিস এবার তরোয়াল খুলল। তার-পর পায়ে পায়ে এগিয়ে কাশেমের মুখোমুখি দাঁড়াল। সদার হাততালি দিয়ে কী একটা ইঙ্গিত করতেই কাশেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্র্যান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্র্যান্সিস এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কাশেমের তরোয়ালের আঘাত ঠেকাল বটে কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে বালির ওপর বসে পড়ল। ভীড়ের মধ্যে থেকে হাসির হর্‌রা উঠল। আবার কাশেম তরোয়াল চালাল। এবারও একই ভঙ্গীতে ফ্র্যান্সিস কাশেমের তরোয়ালের ঘা থেকে আত্মরক্ষা করল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে কাশেমকে লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল।

শুরু হল দুজনের লড়াই। বিদ্যুৎগতিতে দু'জনের তরোয়াল ঘুরছে। মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয় চকচক করছে তরোয়ালের ফলা। ঠং ঠং—ধাতব শব্দ উঠছে তরোয়ালের ঠোকাঠুকিতে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মরু-দস্যুর দল দেখতে লাগল এই তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। দু'জনেরই ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল। কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠল। হঠাৎ ফ্র্যান্সিসের একটা প্রচণ্ড আঘাত সামলাতে না পেরে বালিতে কাশেমের পা সরে গেল। কাশেম কাত হয়ে পড়ল। ফ্র্যান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। দেহের

সমস্ত শক্তি দিয়ে তরোয়াল চালাল। কাশেম মরীয়া হয়ে সে আঘাত ফেরাল কিন্তু মুঠি আলগা হয়ে তরোয়াল ছিটকে পড়ল একটু দূরে। কাশেম চিৎ হয়ে বালিতে পড়ে গেল, ফ্র্যান্সিস তরোয়াল নামিয়ে কাশেমের দিকে তাকাল। কাশেমের চোখে মৃত্যুভীতি। মুখ হাঁ করে সে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্র্যান্সিসও হাঁপাচ্ছে। ফ্র্যান্সিস তরোয়ালের ছুঁচোলো ডগাটা কাশেমের লাল আলখাল্লাটায় বিঁধিয়ে একটা টান দিল। লাল আলখাল্লাটা দু'ফালি হয়ে গেল। বুকের অনেকটা জায়গা কেটেও গেল। রক্তে ভিজে উঠল আলখাল্লাটা।

মরু-দস্যুদের মধ্যে গুঞ্জন-ধ্বনি উঠল। কোনদিকে না তাকিয়ে ফ্র্যান্সিস চলল সর্দারের কাছে। ও তো জানে না এ রকম দু'জনের মধ্যে তরোয়ালের লড়াইয়ে বেদুইনদের রীতি কী? সর্দার যা বলবে তাই সে করবে।

কাশেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্র্যান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। [পৃষ্ঠা ৩৫২

—ফ্র্যান্সিস! ফজলের অস্পষ্ট আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে ফ্র্যান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। খোলা গা, উদ্যত তরোয়াল হাতে কখন কাশেম ছুটে এসেছে। ঠিক ওর মাথার ওপর কাশেমের তরোয়াল। পলকমাত্র সময় হাতে। ফ্র্যান্সিস উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়ল। কাশেমের তরোয়াল নামল। বাঁ কাঁধে একটা তীব্র যন্ত্রণা। তরোয়ালের আঘাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফ্র্যান্সিসের কাঁধ ছুঁয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল কাঁধ থেকে। রক্ত দেখে ফ্র্যান্সিসের মাথায় খুন চেপে গেল। কাপুরুষ! ফ্র্যান্সিস উঠে

দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কাশেমের ওপর। কাঁধের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। কাশেম সেই তীব্র আক্রমণের সামনে অসহায় হয়ে পড়ল। পিছিয়ে যেতে যেতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগল, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না সেই আক্রমণের মুখে। তার হাত অবশ হয়ে এল। উপর্যুপরি কয়েকবার আঘাত হেনে সুযোগ বুঝে ফ্র্যান্সিস বিদ্যুৎ-বেগে তরোয়াল চালাল কাশেমের বুক লক্ষ্য করে। কাশেমের গলা দিয়ে একটা কাতর-ধ্বনি উঠল। পরক্ষণেই সে বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল। বুকে বেঁধা তরোয়ালটা টেনে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর শরীরটা স্থির হয়ে গেল। ফ্র্যান্সিস বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে তখনও হাঁপাচ্ছে।

তরোয়াল যুদ্ধের এই ফলাফল দস্যুদলের কেউই আশা করেনি। কারণ এর আগে কাশেমের সঙ্গে তরোয়ালের যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেককেই তারা মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে। তরোয়াল যুদ্ধে কাশেম ছিল অজেয়। সেই কাশেম আজ একজন ভিনদেশীর কাছে শুধু হার স্বীকার করা নয় একেবারে মৃত্যুবরণ করবে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দস্যুদলে কাশেমের অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। তারা দল বেঁধে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ফ্র্যান্সিসকে ঘিরে ধরল তারা, কিন্তু ফ্র্যান্সিসকে আক্রমণ করবার আগেই সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল, তারপর ধীর পায়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল।

কাঁধের যন্ত্রণাটা অনেকখানি কমেছে। একটু আগে সর্দার একজন লোক পাঠিয়ে-ছিল। এই দলে হেকিমের কাজ করে লোকটা। কী একটা কালো আঠার মত ওষুধ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল। একটু পরে ব্যথাটাও কমতে শুরু করল। কিন্তু ফ্র্যান্সিসের চোখে ঘুম নেই। অনেক রাত পর্যন্ত ও জেগে রইল। দেশ ছেড়েছে কতদিন হ'য়ে গেল, তারপর জাহাজে নাবিকের জীবন, বন্ধু জ্যাকব। জাহাজডুবি, সোনার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ, আর আজ কোথায় এসে পড়েছে। নাঃ এখান থেকে পালাতে হবে। ছেলেবেলা থেকে যে সোনার ঘণ্টার স্বপ্ন ও দেখেছে, তার হদিস পেতেই হবে।

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে ফ্র্যান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। কাকুতি মিনতি করতে লাগল। ফ্র্যান্সিস কান পেতে রইল। আবার চিৎকার। ফ্র্যান্সিস দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল। (ক্রমশঃ)

সব্যসাচী

৩

শ্বেতাঙ্গ বন্দী ? এই মহারণ্যের অন্দরে লুকোনো শিফ্‌টা দস্যুদের শিবিরে ?

টারজান আকাশপাতাল ভেবে আকুল। কোন্ দেশে বাড়ি এই বন্দীর ? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা ? কোন্ দেশের অভাগা সন্তান এই নির্মম নরহন্তাদের কবলে পড়ে প্রাণ হারাতে বসেছে ? কী জন্য সে এসেছিল এদেশে ? শিকারের প্রলোভনে ? গুপ্তধনের খোঁজে ? না নিছক দুঃসাহসিকতার প্রেরণায় ?

যা হোক, টারজান যখন এসে পড়েছে লোকটা যমালয়ে পাড়ি দেবার আগেই, ওকে উদ্ধার করার একটা চেষ্টা অবশ্যই সে করবে। নিজের উপর অত্যাচারের প্রতি-শোধ নেবার জন্যই আজকের এই নৈশ অভিযান টারজানের। তার সঙ্গে প্রতিশোধের মামলা আরও একটা জুটে যায় যদি, টারজানের আপত্তি নেই সেটারও বিচারের ভার নিজের হাতে নিতে। সে ফন্দী আঁটতে লাগল মনে মনে।

দস্যুদলকে সাজা দেওয়া সোজা কাজ। দুই চারটা তীর ছুঁড়ে দুই চারজন শিফটাকে হত্যা করলেই সেটা সমাধা হতে পারে। কিন্তু ষাটজন দুর্ধর্ষ দস্যুকে পর্যুদস্ত করে তাদের বন্দীশালা থেকে একটা হাত-পা-বাঁধা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অতি কঠিন কর্ম। কীভাবে যে সেটা করা যেতে পারে, ঠাউরে উঠতে পারে না বনের রাজা।

হঠাৎ বিকট গর্জনে বনভূমি কেঁপে উঠল। মেঘের গুরু গুরু কড় কড় কড়াং ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝি স্তব্ধ ছিল একটু। মুষলধার বর্ষার পূর্বাভাষ এটা। ঠিক সেই সময়টাতেই পশুরাজ ন্যুমার নির্ঘোষ। আগুনের ঠিক ওপিঠেই। কথা এই, লাফিয়ে আগুনের ঐ

বেড়া কি পেরিয়ে আসবে ন্যুমা? সাধারণতঃ শ্বাপদেরা আগুনকে এড়িয়েই চলে। ব্যতিক্রম ঘটে, যখন অসহ্য ক্ষুধায় পীড়িত হয় তারা। এ-সিংহটার উদরের জ্বালা এই মুহূর্তে তীব্রতার কোন্ স্তরে পৌঁছোবে, সেটা জানতে পারলে টারজান এক্ষুণি বলে দিতে পারে যে সিংহ ডাকাডাকি করেই ফিরে যাবে, না বহ্নিবলয় ডিঙ্গিয়ে শত্রুপুরীতে ঢুকেই পড়বে।

সিংহের উপস্থিতি শিফ্‌টারাও অবশ্যই টের পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, আগুনের শত্রু-বিতাড়ন শক্তির উপরে অগাধ বিশ্বাস তাদের। দুই একজন উঠে একবার চক্কোর দিয়ে এল আগুন-বেড়ার গা ঘেঁষে ঘেঁষে। যেখানে ইন্ধনের অভাব বুঝল, সেইখানে গুঁজে দিল দুই একখানা মোটা কাঠ। তারপর শুকনো পাতা ছুঁড়ে মারতে লাগল পাঁজায় পাঁজায় আগুনের ভিতরে, যাতে লকলক করে বহ্নিশিখা লাফিয়ে ওঠে উৎকট উল্লাসে। ঝাঁকে ঝাঁকে রাঙ্গা ফুলকি উড়ে উড়ে চুমকি বসিয়ে দেয় কালো আঁধারের গায়ে। সিংহটা ভয় পেতে পারে তা দেখে।

কিন্তু, উঁহুঃ, ভয় পাওয়ার পাত্র এই সিংহটি মোটেই নয়। একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে সে বোধহয় ফুলকির খেলা পর্যবেক্ষণ করল দারুণ তাচ্ছিল্যে, তারপরই তার দ্বিতীয়বার গজনে নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে গেল শতখান হয়ে।

আর সেই মুহূর্তে নামল বৃষ্টি। প্রথমদিকে বড় বড় ফোঁটা কিছুক্ষণ, তারপর অবিচ্ছিন্ন মুষলধার বর্ষণ প্রপাতের আকারে। শিফ্‌টারা এইবার সংকট উপলব্ধি করল তাদের। এই বর্ষায় আগুন যদি নিবে যায়, তা হলেই তো সর্বনাশ। সিংহকে তখন রুখবে কে? তৎপর হয়ে উঠল দস্যুগুলো।

ঝোপড়ির দরজায় দরজায় আগুন জ্বেলে দিচ্ছে তারা ঝোপড়ির চালার নীচেই। বর্ষার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আশ্রয়ের ভিতর ত ঢুকতেই হবে ওদের, সিংহের আক্রমণ থেকে সে আশ্রয়কে বাঁচাবে ঐ আগুন। অন্ততঃ বাঁচাবে বলেই আশা অভাগাদের। এটা তারা হিসাবের মধ্যে আনেনি যে সিংহ তাড়াবার মত মাথা-সমান উঁচু আগুন দুই মিনিটে জ্বালিয়ে তোলা যায় না।

টারজান ওদিকে চিন্তা করেই চলেছে। একটা রণকৌশল আবছা কল্পনা থেকে বাস্তবে দানা বেঁধে উঠল এতক্ষণে। ডালে ডালে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে গিয়ে সেই গাছটিতে উত্তীর্ণ হল, যার গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে বন্দী শ্বেতাঙ্গ বেচারা। সিংহ-বর্ষাঘটিত ডামাডোলের ভিতর তার কথা এখন আর চিন্তা করছে না কোন শিফ্‌টা। লোকটা নীরবে বসে বসে প্রতীক্ষা করছে—কখন এসে ন্যুমা মহারাজ রাজভোজের উপকরণ হিসাবে কুক্ষিগত করবেন তাকে।

তার পক্ষে তো থোড়াই তফাৎ। শিফ্‌টারাও তাকে মারত। যন্ত্রণা না দিয়েও মারত না নিশ্চয়ই। তার চেয়ে সিংহের উদরস্থ হওয়াতে এমন আর বেশী কি অসুবিধা? সে উদাসীনভাবেই বসে আছে এতক্ষণ। সম্ভবতঃ সিংহ ও শিফ্‌টার মধ্যে ইতরবিশেষ আবিষ্কার করতে পারেনি বলেই উদাসীন থাকতে পেরেছে সে।

এমনি সময়ে ঠিক তার পিছনে এসে দাঁড়াল টারজান। গাছের ওপিঠ দিয়ে সে নেমেছে। সেদিকে নজর রাখবার মত স্থৈর্য কোন শিফ্‌টার মনে তখন নেই।

শিফটারা ঝোপড়িতে ঢুকতে ব্যস্ত, টারজান সুযোগ খুঁজছে, পিছনের দিক থেকে বন্দীর সমুখে এসে দাঁড়াবার। এমন সময়ে ঘটল বিপত্তি। পড়ল ঠিক বন্দীরই সামনে।

ত্বরিতহস্তে কেটে দিচ্ছে দড়ির বাঁধন। [পৃষ্ঠা ৩৫৮

এক বিরাট লাফ দিয়ে আগুন-প্রাচীর টপকে এল ন্যুমা, বন্দীর সামনে বটে, কিন্তু বন্দীর দিকে মুখ করে নয়। তার লক্ষ্য উল্‌টোদিকে, শিফ্‌টারা যেখানে যে-যার ঝোপড়িতে ঢোকার জন্য তৈরী হচ্ছিল, সেইখানটিতেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দীর্ঘ লাঙ্গুল ধীরে ধীরে আন্দোলিত করছে, দুই পিঙ্গল নেত্র জ্বলজ্বল করছে সমুখবর্তী অতি তুচ্ছ দোপেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে। সম্ভবতঃ সে বাছাই করছে যে অতগুলো মানুষের মধ্য থেকে কোন্‌টিকে তার বেছে নেওয়া উচিত। স্বাদে গন্ধে কোন্‌টির রক্তমাংস উপাদেয় লাগবে তার রসনায়।

এই তো সুযোগ! শিফ্‌টারা এখন আত্মরক্ষার চিন্তাতেই বিভোর, বন্দীর দিকে তারা লক্ষ্য করবে না নিশ্চয়। টারজান যদি এই সময়ে এগিয়ে গিয়ে বন্দীর বাঁধনগুলো কেটে দেয় নিজের ছোরা দিয়ে?

ছোরা হাতে নিয়ে টারজান সবে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েছে—

ব্যাং ব্যাং করে ডেকে উঠেছে শিফটাদের রাইফেল। এক সাথে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা। না, টারজানকে তাক করে নয়, টারজানকে তারা দেখতেই পায়নি, তাদের লক্ষ্য ঐ চতুষ্পদ শত্রুটাই আপাততঃ।

অত বৃষ্টিতে তাক ঠিক করা শক্ত কথা, মাত্র দুটো গুলি লাগল ন্যুমার গায়ে। একটা কাঁধে, একটা সমুখের বাঁ পায়ে। একটা জখমও মারাত্মক হতে পারেনি যে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ন্যুমার ভাবে ভঙ্গীতে। গুলির জবাবে যে গর্জন সে ছুঁড়ল, তাতে ক্রোধের প্রকাশ হল যতখানি, তার সিকিও নয় ভয় বা যন্ত্রণার।

এইবার সে দিল লাফ।

টারজান নীরবে দাঁড়িয়ে নেই এতক্ষণ। বন্দীর সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ত্বরিত-হস্তে কেটে দিচ্ছে তার হাত আর পা থেকে দড়ির বাঁধন। লোকটা প্রথমে ভাব দেখাল অতিমাত্র বিস্ময়ের। সেটা অবশ্যই টারজানের মত একটা কৌপীন সম্বল দৈত্য-কার শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে আচম্বিতে তার সমুখে আবির্ভূত হতে দেখে। কিন্তু সেই বিস্ময়ের চমকটার পরে আর কোন আবেগের আভাস ফুটল না তার মুখে। একান্ত উদাসীনভাবেই সে দেখতে লাগল আগন্তুকের কার্যকলাপ।

টারজান বুঝল। বন্দীর এই নিরুৎসুক নিরুৎসাহ ভাবের মানে হতে পারে একটাই। সে বুঝতে পারেনি যে টারজান মিত্র ভাবে তার কাছে এসেছে। অবশ্যই টারজানকে শিফ্‌টাদেরই দলভুক্ত লোক বলে ভেবে নিয়েছে সে। তা ছাড়া অন্য আর কীই বা পারে ভাবতে? শিফ্‌টা ছাড়া কাফা অঞ্চলের এই পার্বত্য বনভূমিতে অন্য শ্রেণীর মানুষ কেউ আছে বলে তো তার ধারণা থাকার কথা নয়। আর অন্য শ্রেণীর লোক থাকেও যদি, সে ঢুকবে কেমন করে দস্যুশিবিরে? কেমন করে এবং কেন? না, টারজানকে শিফটাদের শত্রু বলে যদি সে ভাবত, সেটাই হত আশ্চর্য।

সিংহের গর্জন উঠছে মুহুর্মুহুঃ, ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করছে অর্ধশত শিফ্‌টা, মাঝে মাঝে তাদের দুই একজনের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদও বেরোচ্ছে। রীতিমত লড়াই চলেছে পশুতে মানুষে। রীতিমত সুপরিচালিত যুদ্ধ। সিংহ এখনও শিকার ধরতে পারেনি, তা বেশ বুঝতে পারছে টারজান, ওদিকে না তাকিয়েও। ধরতে পারলে সেই শিকারকে মুখে নিয়ে এতক্ষণ আগুন-বেড়া পেরিয়ে এক লম্ফে অরণ্যের অন্ধকারে উধাও হয়ে যেত ন্যুমা।

আগুন এখনও জ্বলছে, তবে আগের চেয়ে অনেক ঢিমিয়ে। জলস্রোতে তা ভেসে গিয়েছে কোন কোন স্থানে, কোথাও আবার বড় বড় কাঠের টুকরোর নীচের অংশটাতে গনগন করছে রক্তচক্ষু মেলে। টারজান ইশারা করল বন্দীকে, পেরিয়ে চল ঐ আগুনের নিবন্ত বেষ্টনী।

বন্দী উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু অত সহজে কি আর কার্যসিদ্ধি হয়? শিফ্‌টাদের কায়দায় আনতে না পেরে ন্যুমা লাফের পরে লাফ দিচ্ছে অনবরত, ঠাঁই পালটাচ্ছে এখান থেকে ওখানে। স্বভাবতঃই ঠাঁই বদল করতে হচ্ছে শিফ্‌টাদেরও। এইভাবেই একটা শিফ্‌টা দলছুট হয়ে এসে পড়েছে টারজানদের দিকেই।

টারজান লাফ দিয়েছে একটা। [পৃষ্ঠা ৩৬০

তার বোধ হয় মতলব ছিল গাছে চড়ে বসে সেখান থেকে রাইফেল চালাবার। বেছে বেছে সেই গাছটার দিকেই সে এসেছে, যার গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল বিদেশী বন্দীটাকে। দূর থেকে সে লক্ষ্য করেনি যে গাছের গোড়ায় মানুষ এখন আর একজন মাত্র নেই, সংখ্যাটা দুইয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে।

টারজানের দৃষ্টি সর্বদিকে। শিফ্‌টাকে সে ছুটে আসতে দেখেছে। বন্দীকে নিয়ে তার সামনে দিয়ে পালাতে গেলে রাইফেলের গুলিতে মারা পড়ার ভয় বিলক্ষণ আছে।

টারজান একা হলে কোন ঝামেলা ছিল না, লাফিয়ে এই গাছেই উঠে পড়ত, আর ডালে ডালে এ গাছ ও গাছ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে যেত চোখের পলকে, কিন্তু একা সে

নয়। সঙ্গে একটা লোক আছে, এমন লোক যাকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সে নিজের কাছেই নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছে। এখন পালানোর চেষ্টা করতে হলে সর্বপ্রথমে ভাবতে হবে যে আশ্রিত লোকটা সে চেষ্টায় তার সহগামী হতে পারবে কিনা। তা এমন ত টারজানের ধারণাতেই আসে না যে গাছে গাছে বানরের মত বিচরণ করার বিদ্যে জানা আছে এই লোকটির।

অতএব সে চেষ্টা না করাই ভাল। তার বদলে—

এসে পড়েছে দুর্বৃত্ত শিফ্‌টা। দুইজন লোককে গাছতলায় দেখে সে অবাক্ হলেও ভয় পায়নি। কেন পাবে ভয়? রাইফেল আছে না তার হাতে? দাঁড়িয়ে পড়ে সে তাক করছে। দুটো মূর্তি দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে, মরুক যেটা মরে। বাছবিচারের প্রয়োজন দেখে না সে, সময়ও নেই তার। গুলি করবার জন্য সে প্রস্তুত, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

টারজান লাফ দিয়েছে একটা। এত বড় লম্বা লাফ যে কোন মানুষ দিতে পারে, হতভাগ্য শিফ্‌টা তা জানবে কেমন করে? জন্তু জানোয়ারের মধ্যে শীটার লাফই সবচেয়ে লম্বা (শীটা হল চিতার নাম), সে লাফকেও হার মানিয়েছে টারজানের এই লাফ। অন্ততঃ ত্রিশ ফুট ব্যবধান ত ছিলই শিফ্‌টার আর টারজানের মধ্যে। এই দূরত্বটা একটিমাত্র লম্ফে অবলীলায় অতিক্রম করে এসেছে মহাকপিদের পোষ্যপুত্র টারজান। এক সেকেণ্ডের ভিতর এসে পড়েছে একেবারে রাইফেলধারী শত্রুর ঘাড়ের উপরে। গুলি চালানো তো পরের কথা, ব্যাপারটা যে কী হল, তাই হঠাৎ উপলব্ধি করে উঠতে পারল না অভাগা দস্যু। উপলব্ধি যখন করল, তখন গুলি করা মাথায় থাকুক, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত তার আর করার উপায় নেই। নেই যে, তার কারণ হল এই যে টারজান দুই হাতে তার গলা চেপে ধরেছে, কণ্ঠনলীকে এমনভাবে পেষণ করছে যে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে হতভাগ্যের।

দুই মিনিট বাদে তার নিষ্প্রাণ দেহটা নেতিয়ে পড়ল টারজানের পায়ের কাছে। আগুন তখন নিবেই গিয়েছে বলতে গেলে। ওদিকের শিফ্‌টারা বিজয়োল্লাসে কোলাহল করে উঠেছে। কোলাহলের কারণ আর কিছু নয়, অসম যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে পশুরাজ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন এইমাত্র, ক্ষতবিক্ষত দেহে পিছন ফিরে লম্বা লাফ দিয়েছে, এই বিপজ্জনক অভিযানে ইস্তফা দিয়ে অরণ্যের নিরাপদে আশ্রয়ে ফিরে যাবার জন্য।

ন্যুমা লাফ দিয়েছে। কোন্‌দিকে?

ঘটনাচক্রে টারজানের দিকেই। লাফিয়ে এসে যেখানটাতে ভূমি স্পর্শ করল ন্যুমা, সেখান থেকে মাত্র পাঁচ ছয় ফুট তফাতেই দাঁড়িয়ে আছে টারজান, নিহত দস্যুর

দেহটাকে পায়ের তলায় নিয়ে। সিংহ আবারও লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এবার আর দীর্ঘ লম্ফের আবশ্যক দেখছে না সে, দুই পা এগিয়ে থাবাটা বাড়িয়ে দেওয়ার ওয়াস্তা, নাগালের ভিতরই দাঁড়িয়ে আছে জলজ্যান্ত টারজান। সুনিশ্চিত সাফল্যের আনন্দে সে হুংকার করে উঠল বজ্রের গর্জনকেও ছাপিয়ে।

টারজান এরকম সিংহ ঢের শিকার করেছে, কোন অস্ত্রের সাহায্য না নিয়েই। স্রেফ বাহুবলেই। নিজের দেহে আঁচড়টিও লাগতে না দিয়ে। কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘ মল্লযুদ্ধের ব্যাপার একটা। এখানে সে-সময় কই? শিফ্‌টারা যে কোন মুহূর্তে তেড়ে এসে তাকে আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। শুধু সিংহ বা শুধু শিফ্‌টা, একটা শত্রুর মোকাবিলা করতে টারজান সদাই তৈরী। কিন্তু একসঙ্গে দুটো? বিশেষতঃ যখন অন্য একটা অসহায় মানুষের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে তার উপরে? না, সিংহবধের উদ্যম এক্ষেত্রে আর করবে না টারজান।

টারজান করল খুবই সোজা একটা জিনিস। শিফ্‌টার মৃতদেহটা ডান হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল পশুরাজের মুখের উপরে। সিংহ ভাবল কোন ধৃষ্ট দোপেয়ে আক্রমণই বুঝি করেছে তাকে, সেই মৃতদেহের উপরে প্রহার করল যমদণ্ডবৎ প্রচণ্ড থাবা, দেহের সর্বশক্তি দিয়ে। মৃতদেহ পড়ে গেল, সিংহ ভাবল এতক্ষণে একটা শিকার জুটল তার। এক ঝটকায় সেই দেহ পিঠের উপর ফেলে সে আর এক লাফে পেরিয়ে গেল আগুনের নিবন্ত বেড়া, চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল অরণ্যের আঁধারে।

এদিকে টারজানও অদৃশ্য হয়ে গেল পড়ে-পাওয়া সাথীর হাত ধরে টানতে টানতে। শিফ্‌টারা যখন সেখানে এল বন্দীর খোঁজে, দেখল কেউ নেই গাছতলায়?

নিজেদের সংখ্যা যখন গণন করল তারা, তখনও দেখল একজন কম। এসব কেমন করে ঘটল, তা বুঝতে পারে না লোকগুলো। হাত-পা-বাঁধা বন্দী বা কেমন করে পালায়, আর সহকর্মী একজনই বা যায় কোথায় টুঁ শব্দটি না করে? সিংহ? দু দুটো লোককে একসাথে নিয়ে যাবে একটা মাত্র সিংহ? অসম্ভব! আর দুটো সিংহ যে হানা দিয়েছিল এ-ডেরায়, তারও ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি!

বন্দীকে বাঁধা হয়েছিল দড়ি দিয়ে। সে সব দড়ি পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠল দস্যুদের। দড়িগুলো টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে ছোরার সাহায্যে। একাজ বন্দী নিশ্চয়ই নিজে করতে পারে নি। তার সঙ্গে কোন অস্ত্রই ছিল না। তবে কি তাদের সহকর্মীটা বেইমানি করল? সেই মুক্ত করে দিল বন্দীকে, গজদন্তের প্রলোভনে পড়ে। বন্দীটা গজদন্ত পুরীর অধিকারী বলে সন্দেহ করেই তাকে ওরা জ্যান্ত রেখেছিল এতদিন, এই আশায় যে গজদন্তপুরীতে পৌঁছোবার

রাস্তা সে বাতলে দেবে। এখন এই বেইমান সঙ্গী যদি একা একা সব গজদন্ত দখল করবার ফিকির করে থাকে—

"মারা পড়বে আহাম্মক"—হিংস্র মন্তব্য করল সব শিফ্‌টা সমস্বরে।

মারা যে সে অভাগা আগেই পড়েছে, তা এই দস্যুরা জানল না, জানবে না কোনদিনও।

শিফটারা এদিকে নিজেদের হাত-পা কামড়াতে থাকুক আফসোসে আর আক্রোশে। টারজান তার সঙ্গীকে নিয়ে উধাও হয়েছে গভীর জঙ্গলে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, নিবিড় অরণ্য, গাছে গাছে ধাক্কা লাগছে গায়ে, কাঁটায় কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সারা অঙ্গ, টারজন তারই মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে অভ্রান্ত লক্ষ্যে। সাথী ভাবে—এ লোকটা নিশ্চয়ই এ জঙ্গলের বাসিন্দা, তা নইলে পথ চিনে চিনে যেতে পারে কখনো এই আঁধারে? পথ যে সেখানে নেই, তা ত সে হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছে। তবু একটা লক্ষ্য স্থির না করে কেউ কখনো এমন অবিচলিত পদক্ষেপে ক্রমাগত এগুতে পারে না। এ লোকটার চালে চলনে দিশেহারার লক্ষণ কিছুমাত্র নেই।

সিংহ গর্জাচ্ছে, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো পিছনে। কত অসংখ্য সিংহ এ অরণ্যে, কে জানে। একবার টারজান হঠাৎ থেমে সঙ্গীকে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দিল, তারপর এক অজানা ভাষায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জোরে জোরে কী সব যেন বলতে লাগল। সাথী হতভম্ব। কাকে কী বলছে এই রহস্যময় সাথী? এ-ভাষা নিজে সে বুঝতে পারছে না, তাতে সে অবাক্ হয়নি। অবাক্ হয়েছে এইটি উপলব্ধি করে যে ওটা মানুষের সমাজে প্রচলিত কোন ভাষাই নয়। ওটা চিতাদের ভাষা। সমুখের গাছের একটা নীচু ডাল অবলম্বন করে ওত পেতে রয়েছেন মহারানী শীটা। বনচরদের সহজাত অদৃশ্য ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেটা টের পেয়েছে টারজান। ছোট বড় সব বন্য জন্তুর ভাষাই সে জানে, শীটার নিজের ভাষাতেই সে শাসিয়ে যাচ্ছে তাকে—"আমি টারজান, বনের রাজা। ন্যুমার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে আমি মট্‌কে দিই প্যাকাটির মত, ময়াল হিস্‌টাকে মালা করে পরি গলায়, গণ্ডার গোগোর শিং উপড়ে নিই নাকের উপর থেকে। আমার পথ আগলাবি, এত সাহস তোর?"

শীটা বুঝল। এই সেই টারজান? চোখে এ যাবৎ দেখেনি বনের রাজাকে, কিন্তু তার গল্প তো সে শুনেছে অনেক। সারা আফ্রিকার অরণ্যে অরণ্যে যত জানোয়ার আছে, কেই বা শোনে নি সেই মহাকপি-লালিত অরণ্যদেবের কথা? নিবিড় অন্ধকারেও দেখতে পায় চিতারা, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শীটা একবার শালপ্রাংশু অবয়বটা দেখে নিল টারজানের, তারপর ঘড়রঘড় আওয়াজ খানিকটা করল তাকে লক্ষ্য করে, তারপর এক

লাফে গাছের ডালা থেকে ঝুপ করে গিয়ে পড়ল বিশ ফুট দূরের একটা ঝোপের ভিতরে। আর তার কোন সাড়াই টারজান পেলো না সারা রাত্রে।

ঘড়রঘড় করে শীটা যা বলে গিয়েছিল, তা প্রাঞ্জল মনুষ্য ভাষায় এইরকমটা দাঁড়ায়—"বনের রাজাকে প্রণাম জানাই আমি। সারা দুনিয়ার আরণ্য জীবেরা তোমায় রাজা বলে মেনে নিয়েছে যখন, আমিই বা তোমায় অগ্রাহ্য করব কোন্ স্পর্ধায়? কিন্তু কথা হল এই, তোমার সঙ্গে নধর মনুষ্য শাবক রয়েছে একটা, সে তো রাজাও নয় বনের, রাজার কোন আপনজনও নয়। তাকে পেটে পুরবার সনাতন অধিকার আছে আমার। সে অধিকার চোখ রাঙ্গিয়ে কেড়ে নেওয়া রাজোচিত হচ্ছে না হে রাজা! আমি কি আজ নিরম্বু একাদশী করেই রাত কাটাব, বলতে চাও তুমি?"

উড়িষ্যার সাউথ বলণ্ডা নিবাসী শ্রীসলিলকুমার ঘোষাল, শ্রীমতী অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী তারা দেবী ও শ্রীসীতানাথ ঘোষাল তাঁদের স্বর্গগতা স্নেহের পাত্রী মৌঝুরি চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺মৌঝুরি স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

বিজ্ঞান ভিত্তিক রোমাঞ্চকর কাহিনী

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী কার্তিক সংখ্যার শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার ২৫·০০ টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫·০০ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা

হাঁদা-ভোঁদার

দড়ির ফাঁস

আমি তোকে গরু খোঁজা করছি, আর তুই দড়ি হাতে এখানে? কি করছিস দড়ি দিয়ে ?
দড়ির ফাঁস ছোঁড়া প্র্যাক্‌টিস করছি !

এতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে দুষ্কৃতিকারীকে বেঁধে ফেলা যায়— এই যাঃ! আবারও ফস্কে গেলো!
হিঃ হিঃ! সামান্য একটা ফাঁস ছুঁড়তে এতোবার ফস্কাচ্ছিস !

খুব যে ওস্তাদী করছিস হাঁদা! তুই ছুঁড়তে পারিস ?
ফুঃ! খুব ভালো ভাবেই পারি! কম্পিটিশানে প্রাইজ পেয়েছিলাম! দে, তোকে হাতে নাতে করে দেখিয়ে দি!

দ্যাখ, ভোঁদা! এই ভাবে দড়ি ধরে এমনি ভাবে লক্ষ্য বস্তুর ওপর ছুঁড়ে দিতে হয়!
লক্ষ্য বস্তুতে তোকেকলই নারে হাঁদা!

একটায় ঠেকেনি কিন্তু আর একটায় লাগিয়েছি! এবারে কিসে লাগিয়েছি সেটা টেনে এনে দেখা যাক!
?
আঁউক!
পুলিশ, পুলিশ, বচাইয়ে! হামাকে গুম কোরবার চেষ্টা হোচ্ছে!
এ্যাই মরেচে!
কাঁহা গেলো ও বদমাস ডাকু! লেকিন, হাঁথ মে যব পাবো তো দিখাবো এ ডাণ্ডাকা খেল!

মদনমোহন রায়

সম্রাটের লোকজন মুচিকে ধরে নিয়ে এলো একেবারে সম্রাটের সামনে। তিনি তাঁর লোকজনদের চলে যেতে বললেন। মুচির অপরাধ, সম্রাট টিটাসের জন্মদিনে কাজ করেছে। রোমের সমস্ত অধিবাসী তাই স্তম্ভিত।

সম্রাট মুচিকে বললেন, 'তোমার এতদূর স্পর্ধা যে আমার আদেশ অমান্য করো!'

মুচি করজোড়ে জানালো, 'হুজুর! আমাকে প্রতিদিন কম করে আট পেনী রোজগার করতেই হয়, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে। একদিন কাজ না করলে আমার আট পেনী রোজগার হবে না।'

'কিন্তু তোমাকে আট পেনী-ই রোজগার করতে হবে এ কেমন কথা?' সম্রাট প্রশ্ন করলেন।

মুচি তখন কারণ স্বরূপ এই শ্লোকটি বলল ঃ

ফেরত দি' যে দু'পেনী আর দু'পেনী ধার দেয়া।
দু'পেনী যে হারাই আমি দু'পেনী মোর নেয়া॥

সম্রাট বললেন, 'এর অর্থ কি? স্পষ্ট করে বলো।'

মুচি বলল, 'জাঁহাপনা! অনুগ্রহ করে শুনুন। দু'পেনী আমি আমার বৃদ্ধ পিতাকে দি। তিনি আমায় শৈশবে খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি এখন এত বৃদ্ধ যে কাজ করতে অশক্ত। আমার শিশু-পুত্রের জন্যে আমি দু'পেনী খরচ করি, তার আহার ও পরিধানের ব্যাপারে। আমিও এক সময় বৃদ্ধ ও কাজ করতে অসমর্থ হব। তখন সেও আমায় এইভাবে ফেরত দেবে যেমন করে আমি আমার পিতাকে ফেরত দিচ্ছি। আমার

স্ত্রীকে প্রতিদিন দু'পেনী করে দিতে হয়। মহারাজ! আমার স্ত্রী খুব লোভী ও কৃপণ। সে খরচ না করে মাটিতে পুঁতে রাখে। সেগুলো পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং দু'পেনী হারাতে হয়। সবশেষে এই অধম নিজের জন্যে দু'পেনী রাখে।'

সম্রাট কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে, এবার তোমায় ক্ষমা করছি, কিন্তু মনে রেখো তুমি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কাউকে বলবে না যতক্ষণ না তুমি আমাকে শতবার দেখছ। এর অন্যথা হলে তোমায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।'

মুচি বলল, 'যে আজ্ঞা মহারাজ।'

বিকেলে সম্রাট তাঁর মন্ত্রণা সভার সভ্যদের ডাকলেন ও মুচির বলা শ্লোকটির

রাজার লোকজন মুচিকে বেঁধে নিয়ে এলো।
[পৃষ্ঠা ৩৬৮

অর্থ জানতে চাইলেন তাঁদের কাছে। তাঁরা জ্ঞানী ও গুণী হওয়া সত্ত্বেও সত্বর একটা উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পেলেন না। তাঁদের ধারণা একটু সময় পেলে উত্তর দেয়া মোটেই শক্ত হবে না। তাঁরা সম্রাটের কাছে এক সপ্তাহ সময় চাইলেন। তিনিও তাতে সম্মত হলেন। ষষ্ঠ দিনের শেষেও তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরে রয়ে গেলেন। সকলেই যেন হতভম্ব। অবশেষে ওঁদের একজন হঠাৎ একটা খেই পেয়ে গেলেন যে সম্রাট মুচিকে দেখার পর এই ধাঁধাটি আমাদের সামনে রেখেছেন। সুতরাং মুচিটি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করলেও করতে পারে। যেই না ভাবা অমনি সেই কাজ। তিনি তখনি মুচির কাছে গেলেন সমাধানের জন্যে। তিনি অবশ্য এর জন্যে মুচিকে একশত রাজকীয় মুদ্রা পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করবেন—এমন কথা তিনি মুচিকে দিলেন।

মুচিটি কিছুক্ষণ কী একটা ভাবলো। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে সে মুদ্রাগুলো দেখতে পাবে কি না। তার কাছে মুদ্রার থলি রাখা হল। সে একটি একটি করে মুদ্রা বার করল আর অনেকক্ষণ ধরে তা নিরীক্ষণ করলো। ভদ্রলোক অধৈর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন মুচির প্রতিটি মুদ্রা দর্শন। সে একশত দ্রা মুনিরীক্ষণ করে আবার সেগুলো থলির মধ্যে রেখে দিল।

তারপর ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বরূপ তা-ই নিবেদন করলো যা সম্রাটকে জানিয়েছিলো। সভাসদ প্রতিশ্রুতি মত একশত রাজকীয় মুদ্রা মুচিকে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সম্রাটের কাছে ছুটলেন।

তিনি সম্রাটকে বললেন, 'মহারাজ আপনার শ্লোকের ব্যাখ্যা খুব-ই সহজ এবং এই সমাধান'—বলে সমাধান ব্যাখ্যা করলেন। সম্রাটের কিন্তু স্থির বিশ্বাস কারও সাহায্য ছাড়া এ সমাধান সম্ভব নয়। মুচি নিশ্চয় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। সুতরাং তিনি অবিলম্বে তাঁর সামনে মুচিকে হাজির করবার আদেশ করলেন। তাঁর লোকজন মুচিকে বেঁধে নিয়ে এলো। মুচি কিন্তু নির্বিকার।

সম্রাট বললেন, 'জানো আমার আদেশ লঙ্ঘন আর মৃত্যুকে আহ্বান একই কথা।' সম্রাট থরথর করে কাঁপছেন আর রোষ-কষায়িত নেত্রে মুচির দিকে তাকিয়ে আছেন।

মুচি ধীর স্থির হয়ে সম্রাটকে বলল, 'আপনার যা শাস্তি আমায় দেবেন আমি তা মাথা পেতে নেবো। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা নিবেদন করতে দিন। আপনি বলেছিলেন আপনার মুখ শতবার দেখার আগে ওই পঙ্‌ক্তি দুটোর ব্যাখ্যা আমি করতে পারবো না কারও কাছে। আমি একশত রাজকীয় মুদ্রায় আপনাকে একশত বার-ই দেখেছি। তারপর মাননীয় সভাসদ মহাশয়কে পঙ্‌ক্তি দুটোর ব্যাখ্যা বলেছি।'

তখন উপস্থিত সভাসদবর্গ পাত্রমিত্র সকলে মুচির চতুরতায় মনে মনে বাহবা দিলেন।

সম্রাট মুচির সাহস ও বুদ্ধির প্রাখর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি শান্ত হয়ে মুচিকে বললেন, 'আমার সমস্ত সভাসদের চেয়েও তোমার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনেক বেশী। তুমি অবশ্যই আমার কাছ থেকেও পুরস্কার লাভ করবে।' সম্রাট মুচিকে একশত রাজকীয় মুদ্রা দেবার জন্যে আদেশ করলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে।

বাতাসের চেয়ে হালকা বেলুন

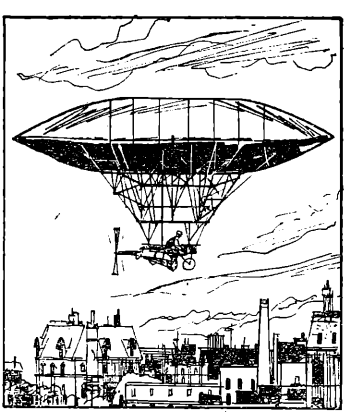

আজকাল মটোর ইঞ্জিন চালিত হেলিকোপটার প্রপেলারের সাহায্যে আকাশে ওড়ে, এদিক ওদিক চলাফেরা করে। কিন্তু প্রথম যে ব্যক্তি আকাশে উড়ে প্রপেলারের সাহায্যে এদিকে ওদিকে ঘোরা-ফেরা করেছিলেন তাঁর নাম প্রফেসার রিচেল। তিনি বাতাসের চেয়ে হালকা বেলুনে চড়ে, বাইসিকেলের পা দিয়ে প্যাডেল চালিয়ে প্রপেলার ঘুরিয়ে আকাশে ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করেছেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

"৺কাননবালা ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

কাপুরুষতার ফল

এম. আব্দুল

আজকের ভারত একদিন আয়তনে ছিল অনেক বড়। তখন এর নাম ছিল ভারতবর্ষ। অবশ্য দেশটা ছিল তখন বিদেশী ইংরেজ সরকারের শাসনাধীন। ইংরেজ জাতি ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর অনেক দেশের একছত্র অধিপতি। বিদেশী শাসকের অধীনে নিজেদের পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করে দেশের লোক ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল। তারা স্বাধীনতার দাবি করতে শুরু করলে। ইংরেজ কঠোর হস্তে দমন নীতি চালাতে শুরু করলে। জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন।

বাংলা দেশের বিপ্লবীরাও মেতে উঠেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে। সকলের মুখে এক মন্ত্র—"স্বাধীনতা চাই।" আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে তখন একদিন বাংলার বড়লাটকে চিরদিনের মতো পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেবার তাগিদ এল দুটি বাঙালী তরুণের উপর।

দলনায়কের আদেশ পালন করবার জন্য প্রস্তুত হল দুই তরুণ। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ওরা। হাতে বোমা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বড়লাটের গমনপথের ধারে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। গাড়িটাকে আসতে দেখে ওরা মুহূর্তের মধ্যে তৈরী হয়ে নেয় দল-নায়কের দেওয়া নির্দেশ পালনের জন্য। সামনে বিপদ, খুব হুঁশিয়ার।

গাড়িটা কাছাকাছি নাগালের মধ্যে আসতেই ওরা একসঙ্গে দুটো বড় সাইজের বোমা ছুড়ে দিল তাকে লক্ষ্য করে। ভয়ংকর শব্দ করে বিস্ফোরিত হল সে দুটো। দুই তরুণ তখন দৌড় শুরু করেছে যে যার মতো, পিছনে চাওয়ার অবসর নেই, কে যে কোন দিকে গেল তা তারা নিজেরাই জানল না। শুধু ছুটে চলেছে। ছুটতে ছুটতে দিনের অল্প সময়টুকু কাটিয়ে দিল। নেমে এল অন্ধকার। ভীষণ ক্লান্ত ওরা, ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, আর ছুটতে পারছে না। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। গতিবেগটা কমিয়ে দিল।

ওরা যে বোমা দুটি ছুড়েছিল তার আঘাতে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। এই দুর্ঘটনার খবর মুহূর্তের মধ্যে প্রচারিত হল সারা দেশে। ঘোষিত হল পুরস্কারের অঙ্ক। রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও তাদের কর্মকর্তারা। যেমন করেই হোক খুজে বার করা চাই সেই আততায়ীদের।

ভয়ংকর শব্দ করে বিস্ফোরিত হল সে দুটো। [পৃষ্ঠা ৩৬৯

সবেমাত্র রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। ঠিক এমনি সময় দুই বিপ্লবী তরুণের একজন এসে দাঁড়াল একটা দোকানের সামনে। উদ্দেশ্য মুখ হাত ধোওয়া। দোকান থেকে জল নিয়ে সবে মাত্র মুখ ধুতে যাবে, ঠিক তখনি ধরা পড়ল একজন পুলিসের কাছে। পুলিস বলল—"তুমি বন্দী, তোমাকে বোমা বিস্ফোরণের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।" পুলিসের মুখে এ ধরনের কথা শুনে ঐ তরুণকে বিচলিত হতে দেখা গেল না। বন্দীত্ব বরণ করে নিল।

দ্বিতীয় তরুণ তখন চলেছে ট্রেনের কামরায়, পালিয়ে যাচ্ছে দূরে। ঠিক তারই পাশে বসে আছে একজন ভদ্রলোক, পোশাক পরিচ্ছদ ধোপদুরস্ত। সে প্রশ্ন করে,—"কোথায় যাবেন?" "জানি না।" জবাব দেয় পলাতক। সে আবার বলে,—"তবু? নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে?" "না, কোন তবু নেই।" দ্বিতীয় জবাব।

প্রশ্নকর্তা বেশ অবাক্ হয় ওর ঐ ধরনের কথায়, বলে,—"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুবই বিচলিত। আমি বাঙালী, আমার কাছে এত সংকোচ কেন? বলুন না কোথায় যাবেন? আমাকে দিয়ে কোন উপকারও তো হতে পারে?"

"আমি যে কোথায় যাচ্ছি তা আমি নিজেই জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি আমি পালিয়ে যাচ্ছি।"

—"পালিয়ে যাচ্ছেন!" ভদ্রলোকের কণ্ঠে রীতিমত বিস্ময়—"কেন, কি হয়েছে কি?"

—"আমি জানি না, আপনি কেন আমার সম্বন্ধে জানবার জন্য এত বেশী উদ্‌গ্রীব। তবে আমি আপনাকে নিরাশ করব না। আপনি বাঙালী আমিও বাঙালী। বাঙালী হয়ে স্বজাতির কোন ক্ষতি করবেন না সেটাই আমার বিশ্বাস। বলুন, আমার কথার মূল্য রাখতে পারবেন?"

—"আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন? বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন।"

—"বেশ, তবে শুনুন। গতকাল আমি ও আমার এক বন্ধু বড়লাটের গাড়িতে বোমা মেরেছি, যাতে ধরা না পড়তে হয় তাই চলে যাচ্ছি।"

আর তেমন কোন কথা হল না সদ্য পরিচিত দুই ব্যক্তির মধ্যে। গাড়ি একই তালে ছুটে চলেছে। এবার থামবে শ্রীরামপুর স্টেশনে।

গাড়ি থামার আগেই কোন এক ফাঁকে ঐ ভদ্রলোক পুলিসে ফোন করে শ্রীরামপুর স্টেশনে তাদের মোতায়েন থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেখানে বহু পুলিস। একটু আগে যিনি ছিলেন বন্ধু, তিনি এখন আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রেখে বললেন,—"তুমি আমাদের বন্দী।"

বিপ্লবী বাধ্য হল গাড়ি থেকে নেমে পড়তে। মুখে কোন কথা নেই। চোয়ালের মাংসপেশীগুলো ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠেছে আক্রোশে। যাকে সে বিশ্বাস করে মনের কথা বলেছে, সে যখন কাপুরুষের মতো ধরিয়ে দিল তখন ওকে ছাড়লে হবে না। শাস্তি ওকে পেতেই হবে। কাপড়ের আড়াল থেকে বার করে তার পিস্তলটা, বলল,—"ওহে বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ, ভেবেছিস আমাকে ধরিয়ে দিয়ে ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করবি? তা হবে না। আমি যাব, তবে তার আগে তোকেও আমার সঙ্গী করে নেব।"

ওর হাতের পিস্তলটা গর্জন করে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আবার একটা আওয়াজ, এবার পিস্তলধারী নিজেই ধরাশায়ী হল। তার মুখ থেকে উচ্চারিত হল,—"তোমাদের দেওয়া শাস্তি পাওয়ার আগেই আমি পৃথিবীর বুক থেকে সরে গেলাম।"

এই বিপ্লবী তরুণের নাম—"শ্রীপ্রফুল্ল চাকী"।

আগে যে তরুণটি ধরা পড়েছিল পুলিসের হাতে, তার নাম—"ক্ষুদিরাম বোস"।

"৺কাননবালা ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

অভিমানী ভুলি

চিন্ময় গুহ

ছোট্ট ছেলে টিটু। বাড়ির সবার ছোটো, সবচাইতে আদরও বেশী তাই। নিত্য নতুন আব্দার ওর। সবই যে সবসময় পূরণ হয় তা অবশ্য নয়।

সেদিন মেজকাকুর কাছে তিনতলার ঘরে বসে গল্প শুনছিল ও। পরীক্ষার পর স্কুল ছুটি কিনা, তাই দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর টিটু চলে আসে গল্প শুনতে, ওর মেজকাকুর কাছে। তবে একটা শর্তও আছে। রোজ রাত্রে ওকে তাঁর কাছে পড়া দিতে হয়। যাই হোক, সেদিন ওঁর কাছে লাকি মিতার গল্প শুনে ও কুকুর সম্পর্কে ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। কাকুর কাছে কুকুরদের ঘ্রাণশক্তির প্রবলতার কথা শুনে ওর মনে হল—ইস, আমারও যদি একটা কুকুর থাকতো। ব্যস, শুরু হল আব্দার। বাবা, কাকুরা সবার কাছে ও আব্দার ধরে, একটা কুকুর কিনে দাও—দিতেই হবে। বাবা বললেন—"ছিঃ টিটু, এখনও তুমি ছোট, কুকুর নিয়ে কি করবে? উল্টে বরং তোমাকেই কামড়ে বসবে।"

"নাঃ"—দমবে না টিটু। চালাল আব্দার, কিন্তু কোনো ফল হল না। অবশেষে মেজকাকুই বললেন—"তুমি যদি এইবার, মানে সামনের বার ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে ওঠার সময় ফার্স্ট হও, তবেই পাবে খোদ অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা।" টিটু জানে এ কথার অর্থ না পাওয়া। ও লেখাপড়ায় খুবই খারাপ, কোনোরকমে ক্লাসে ওঠে। ও স্বপ্নেও ফার্স্ট হবার কথা ভাবে না।

কিছুদিন কেটে গেছে। সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে ও দেখল রাস্তায় অনেক কটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা খেলা করছে। কোনো কথা না ভেবেই ও একটা সাদা-কালো বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে দৌড়াল বাড়িতে। বাড়ির সবাই আপত্তি করল কুকুরটার জায়গা দিতে। কিন্তু টিটুর জেদ বাবাঃ। তার কাছে সকলেই হেরে গেল। ওর নাম দিল 'ভুলি'।

একতলায় দোতলার সিঁড়ির নীচে প্যাকিং বাক্সটার ভিতরে খড় দিয়ে ওর শোয়ার ব্যবস্থা হল। স্কুল যাবার সময় আর স্কুল থেকে ফেরার পর ওকে খেতে দেয় টিটু। ভুলি কেঁউ কেঁউ করে ডাকে, যখন টিটু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ভুলি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। বিকালে টিটু ওকে মাঠে নিয়ে গিয়ে বল

ছুঁড়ে দেয় আর ভুলি নিয়ে আসে। টিটুর সময় কাটে ভুলিকে নিয়ে। ওর কথা ভীষণ বুঝতে পারে ভুলি। টিটু ডাকলেই কাছে এসে লেজ নাড়ায়।

সেদিন একটা ঘটনা ঘটল। অনেক রাত্রি। সবাই ঘুমাচ্ছে, টিটুও। হঠাৎ ভুলির নীচ থেকে ভীষণ চিৎকারে আর বাসন পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল সবার। একতলায় গিয়ে সবাই দেখল সদর দরজার সামনে ভুলি দাঁড়িয়ে, আর ওর পায়ের কাছে তিনটে কাঁসার থালা আর একটা গেলাস ছড়িয়ে পড়ে আছে। সবাই বুঝতে পারল চোর কোনোক্রমে বাড়িতে ঢুকে বাসনগুলো চুরি করে সদর দরজা দিয়ে পালাতে গিয়ে ভুলির চিৎকারে আচমকা ভয় পেয়ে বাসনকোসন ফেলে পালিয়েছে। মেজকাকু বললেন—"দেখলি তো টিটু, কুকুরদের ঘ্রাণশক্তি কি রকম প্রবল।" গর্বে বুক ফুলে উঠল টিটুর।

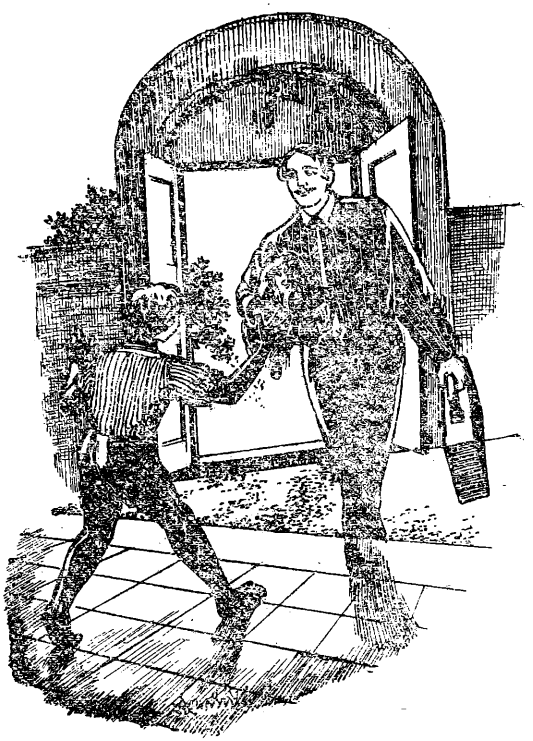

টিটু ছুটে গেল কুকুরটাকে কোলে নিতে।

* * *

সেদিন হঠাৎ বড়দা অফিস থেকে ফেরার সময় একটা বিলিতী কুকুর নিয়ে এল। এতদিন পরে রাশভারী বড়দাকে টিটুর বেশ ভালো লাগল। ছুটে গিয়ে কোলে নিল কুকুরটাকে। কি সুন্দর ভুলভুলি লোম। বাবা বললেন, "ওর নাম থাক, 'টমি'।" মেজকাকু বললেন, "এসব কুকুরের আবার মাংস ছাড়া চলবে না। দাদা, রোজ সকালে লোচনকে দিয়ে মাংস আনিও।" মা বললেন—"গয়লাকে বোলে দেবখন দুধটা যেন আধ সের করে বেশী দেয়।"

টিটু টমিকে আদর করছে। ওর নরম গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বাবাকে বলল, "বাবা একটা বকলেশ কিনে এনো টমির জন্য।"

* * *

"আগুন, আগুন পালাও পালাও !!"

আগুন লেগেছে টিটুদের বাড়িতে। সবাই দোতলায় খেতে বসেছে। মা উনুনে কড়াইয়ে তেল দিয়ে কি যেন ভাজছেন আর টিটুদের কাছে এসে পরিবেশন করছেন। রোববার কিনা, তাই আজ খাওয়াদাওয়ার খুব বহর। এমন সময় কড়াইয়ে তেল গরম হয়ে আগুন লেগে যায় এবং টিটু ঠিক জানে না কি করে সারা বাড়িতে আগুন জ্বলে গেল। বাবা, কাকুরা, দাদা, মা সবাই টিটুকে নিয়ে পড়িমরি করে দৌড়ে নীচে নেমে এলেন, টিটু বগলে করে কোনোরকমে টমিকে নিয়ে এসেছে। বাবা বললেন, "ভাগ্যিস টিটু এনেছে টমিকে।" হতভাগ্য ভুলি! টমির কাছে ভুলিও ছিল। কিন্তু টিটু তখন কোনোরকমে টমিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ভুলির কথা ভাবেনি, ভুলি পালাতে পারেনি। আগুনের মাঝে আটকা পড়ে বোকার মত ভুলি দাঁড়িয়ে ছিল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সবাই আগুনের মধ্য থেকে ভুলির কান্না শুনতে পেল। কিন্তু সাহস করে টিটু আগুনে ঢুকে ভুলিকে বার করে আনতে পারল না। দমকলের লোকেরা কোনোরকমে আগুন নেভাল। ধোঁয়ার মধ্যে টিটু ছুটে এসে দেখল পড়ে আছে ভুলির গলিত মৃতদেহ! টিটুর দুঃখে বুক ভেঙে যায়। তার মনে হল যদি সে একবার সাহস করে চেষ্টা করত, তাহলে হয়তো আজ আর ভুলিকে হারাতে হত না। চোখ দিয়ে ঝরঝরিয়ে জল পড়ে ওর। ছোট্ট টমি লেজ নাড়াতে থাকে।

কিন্তু টমিও বেশী দিন বেঁচে থাকেনি। ভুলি মারা যাবার দু'দিন পরে টমি গাড়ি চাপা পড়ে। তাই আজ টিটুর মনে হয়, হয়তো টিটুর কাপুরুষতার জন্য ভুলি টমিকে ডেকে নিয়েছে তার কাছে।

বিজ্ঞানের টানে—

জলে যা ভাসতে দেখা যাচ্ছে তা হল আসলে ক্যামেরা। এগুলি রকেটের সঙ্গে আকাশে ওড়ে। রকেটের চলা আর একটার পর একটা অঙ্গ কাজ মিটলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ছবি নেয়। তারপর কাজ মিটলে রকেট থেকে খসে সাগরের জলে পড়ে। এগুলি তোলবার জন্যে সাঁতারুরা হেলিকোপটারে চড়ে সব সময়ে নজরে রাখে। ক্যামেরা সাগরে পড়তে দেখলেই জলে লাফ দিয়ে পড়ে সেগুলি তুলে আনে। বিজ্ঞানের জন্যে কত যুঁকি নেয় ওরা।

নটরাজন

৯

(প্রলম্ব বধ)

মথুরারাজ কংসের প্রাসাদ।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। পশ্চিম গগনের অস্তাচলগামী সূর্য দিনের শেষে বিদায় নেবার আগেই ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। তবুও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু সোনালী রশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে যেন হাত বাড়িয়ে শেষ বিদায় নিচ্ছে নীচের পৃথিবীর কাছ থেকে। প্রাসাদসংলগ্ন বিরাট উদ্যানের উঁচু গাছগুলো যেন আকাশের ঐ মেঘপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কোন্ এক অজানা আশঙ্কায় সময় গুনছে। গাছের ডালে ডালে পাখীর দল রাতের অন্ধকারকে আহ্বান জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রাসাদের ছাদে অস্থির পায়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন রাজা কংস। মহামন্ত্রী মহাশেন একপাশে দাঁড়িয়ে রাজা কংসের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছেন আর থেকে থেকে চমকে উঠছেন কংসের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনার আশঙ্কায়।

প্রাসাদের দীর্ঘ ছাদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করতে করতে আপন মনে ভেবে চলেছেন রাজা কংস—পরাক্রান্ত রাজা তিনি। তাঁর একটি-মাত্র অঙ্গুলী সংকেতে লক্ষ সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। তাঁর ধন-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের ঈর্ষার বস্তু। কোন কিছুরই অভাব নেই তাঁর। কোন ইচ্ছাই তাঁর অপূর্ণ থাকার নয়। কিন্তু তবুও মনে একবিন্দু শান্তি নেই। এত চেষ্টা, এত ফিকির-ফন্দি খাটিয়েও গোকুলের সেই কৃষ্ণ ছেলেটাকে তিনি কিছুতেই নিজের করায়ত্ব করতে পারলেন না। সমস্ত চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেছে। গোকুলের সেই ছেলেটা দিব্যি দিনে দিনে বড় হচ্ছে। তাকে বধ করবার জন্যে হয় তো প্রস্তুতও হচ্ছে।

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন রাজা কংস। মাথা তুলে আকাশের ঘনকৃষ্ণ মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। গুরু গুরু মেঘের গর্জনের মধ্যে যেন তিনি শুনতে পান বহুদিন আগের সেই শোনা দৈববাণী—তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

উঃ, কী ভয়ংকর ঐ দৈববাণী! কী নিদারুণ ঐ মৃত্যুর পরোয়ানা! একটা সাধারণ ছেলে তাঁর জীবননাশের জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে, আর এমন পরাক্রান্ত রাজা হয়েও তিনি তার কিছুই করতে পারছেন না। নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছুই তাঁর করবার নেই! আকাশের ঐ ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশির মত তাঁর নিজের ভবিষ্যৎও এমনি অন্ধকার —ঘোর তমসাময়।

রাগে দুঃখে মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে রাজা কংসের। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের সেই অদৃশ্য শত্রুর দিকে ভ্রুভঙ্গি করেন। পরক্ষণেই আবার দ্রুত ছন্দে পায়চারি করতে থাকেন।

রাজা কংস একসময় এসে দাঁড়ান ছাদের এক প্রান্তে। দূরে—বহুদূরে মথুরা নগরীর সীমানা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে সারি সারি তালগাছ। ঝাঁকড়া মাথা কালো দৈত্যের মত গাছগুলো যেন একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেইদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

হঠাৎ একসময় চমকে ওঠেন রাজা কংস। একটা ন্যাড়া মাথা তালগাছ যেন একটু একটু দুলছে, বাকী গাছগুলো কিন্তু একেবারেই স্থির।

রাজা কংস গম্ভীর কণ্ঠে মহামন্ত্রী মহাশেনকে ডাকতেই তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী আদেশ মহারাজ?

রাজা কংস সেই তালগাছগুলোর দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে বললেন—ঐগুলো তালগাছ না?

হ্যাঁ মহারাজ। জবাব দেন মহাশেন।

আর মাঝখানে ঐ ওটা বোধহয় বাজে পোড়া তালগাছ, তাই ওর মাথাটা ন্যাড়া, তাই না?

বোধহয় তাই মহারাজ।

কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছেন যে ঐ ন্যাড়া গাছটা নড়ছে?

ভুরুর উপর হাতের আড়াল দিয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশেন সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। তারপর একসময় বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, সত্যিই তো, তালগাছটা তো দিব্যি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে!

রাজা কংস জলদগম্ভীর কণ্ঠে আবার বলে ওঠেন, ভেবে চিন্তে জবাব দিন মহামন্ত্রী। তালগাছ চলতে পারে নাকি ?

সত্যিই তো। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন্ত্রী মহাশেনের কপালে ফুটে ওঠে দুশ্চিন্তার রেখা। তবে ওটা কী ? তালগাছের মত লম্বা অথচ চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে, ওটা কী হতে পারে ?

হঠাৎ মুখখানা খুশীতে ভরে ওঠে মহাশেনের। রাজা কংসের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে তিনি বলে ওঠেন, এবার বুঝতে পেরেছি মহারাজ। ওটা মোটেই তালগাছ নয়, দানব প্রলম্বাসুর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে।

মোটা ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত করে রাজা কংস জিজ্ঞেস করেন, দানব প্রলম্বাসুর কি তালগাছের মত লম্বা নাকি ?

হ্যাঁ, মহারাজ। ঐ দানব ইচ্ছে করলে তালগাছের মত লম্বা হতে পারে, আবার ঘাসের মত ছোটও হতে পারে। তা ছাড়া দানবকুলে খুব বুদ্ধিমান বলে ওর খ্যাতিও আছে।

—কী আদেশ মহারাজ?　[পৃষ্ঠা ৩৭৬

তাই নাকি ? খানিকক্ষণ চিন্তা করেন রাজা কংস। তারপর আবার বললেন, ওকে এখনই আমার কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। এত দিন আমি ঐ রকম একজন বুদ্ধিমান দানবের খোঁজই করছিলাম।

*　　*　　*

দানব প্রলম্বাসুর এসে প্রণাম করে দাঁড়ায় রাজা কংসের সামনে, ভয়ংকর তার চেহারা। কিন্তু রাজার সামনে সেই তালগাছের মত লম্বা শরীরে এসে দাঁড়ানো ঠিক নয় মনে করেই একটু ছোট হয়ে এসে উপস্থিত হয়।

সাধারণ দু'চারটা কথাবার্তার পরে রাজা কংস আসল কথা পাড়েন। বললেন, শুনলাম, তুমি নাকি খুব বুদ্ধিমান। গোকুলের সেই কৃষ্ণ ছেলেটাকে কোনরকমে ধরে

আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো? যদি পারো তবে প্রচুর পুরস্কার পাবে, আর হ্যাঁ, ধরে আনতে যদি অসুবিধা হয় তবে মেরে ফেলতে পারলেও পুরস্কার পাবে।

যথাসম্ভব মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেও দানব প্রলম্বাসুরের দানবীয় কণ্ঠস্বরে প্রাসাদের কক্ষটা গমগম করতে থাকে। জবাব দেয় দানব প্রলম্বাসুর, আমি নরহত্যা করি না, মহারাজ।

ও! তাই নাকি? তুমি দেখছি সন্ন্যাসী দানব। তা যদি একান্তই হত্যা না করতে পারো তবে জ্যান্ত ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে, হত্যার মত পাপ কাজটা না হয় আমিই করবো। রাজা কংসের কণ্ঠস্বরে মিশে থাকে সামান্য একটু বিদ্রূপের সুর।

প্রলম্বাসুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জবাব দেয়, অভয় দেন তো একটা কথা বলি, মহারাজ।

বেশ বলো।

আমার ধারণা, গোকুলের কৃষ্ণ যদি নিজে থেকে ধরা না দেয় তবে তাকে হাতে পাওয়া একান্তই অসম্ভব, তাই এর আগে যাদের আপনি কৃষ্ণ নিধনে পাঠিয়েছিলেন তারা কেউই সফল হতে পারেনি, উলটে তার হাতেই মারা পড়েছে তারা।

বিরক্তকণ্ঠে রাজা কংস বলে ওঠেন, তুমি কি আশা করো ঐ ছেলেটা নিজে থেকে এসে আমার হাতে ধরা দেবে?

না, মহারাজ, অতটা আশা করা যায় না। তবে আমার মনে হয় একটা ভালো ফাঁদ পাতলে হয়ত সে ধরা দিতে পারে।

কেমন করে? প্রশ্ন করেন রাজা কংস।

একটু সময় চিন্তা করে প্রলম্বাসুর বললে, কৌশলে কৃষ্ণকে ধরা সহজ না হলেও তার কোন প্রিয়জনকে ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। আমার মনে হয়, তাকে মুক্ত করতে সে তখন নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসবে।

চিন্তা করতে থাকেন রাজা কংস। তারপর বললেন, প্রস্তাবটা অবশ্য মন্দ নয়, কিন্তু ছেলেটার কোন্ প্রিয়জনকে নিয়ে আসতে চাও তুমি?

আমার মনে হয় ওর দাদা বলরামকেই ও সব চাইতে ভালোবাসে। সেই বলরামকে যদি কৌশলে চুরি করে আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি, তবে কৃষ্ণ আপনার কাছে না এসে কিছুতেই পারবে না।

পারবে তুমি বলরামকে চুরি করে নিয়ে আসতে?

পারবো কিনা জানি না মহারাজ, তবে চেষ্টা করতে পারি।

বেশ তাই করো। যদি কৃতকার্য হও, তবে এমন পুরস্কার পাবে যা নাকি দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে কোনদিন দিতে পারবে না।

দানব প্রলম্বাসুর গড় হয়ে রাজা কংসকে প্রণাম করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে।

*　　*　　*

বৃন্দাবনের ছায়ানিবিড় প্রান্তরে রাখাল বালকেরা রোজই খেলা করে। কিন্তু আজ যেন তাদের খেলার মহোৎসব। কৃষ্ণের বরাবরের সঙ্গী সাথী ছাড়াও দলে দলে অন্য রাখাল বালকেরা এসে ভিড় করেছে সেই খেলার আসরে। এমনকি যে কৃষ্ণ সচরাচর খেলার চাইতে একা কোন গাছের ডালে বাঁশী বাজাতে বেশী পছন্দ করে সেও আজ তার প্রিয় বাঁশীটি কোমরে গুঁজে এসে যোগ দিয়েছে সেই খেলার মহোৎসবে। আর নিজেদের মধ্যে স্বয়ং তাদের রাখাল রাজাকে পেয়ে রাখাল বালকেরাও আজ উচ্ছ্বসিত। তাদের প্রাণচাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে। তাদের প্রাণের স্পন্দন সাড়া জাগায় বৃন্দাবনের প্রতিটি গাছের ডালে, প্রতিটি ফুলের পাপড়িতে।

নির্মেঘ আকাশে সূর্যদেব হাসছেন, পাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রোদের ঝলক ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিটি খেলোয়াড়ের গায়ে, মাথায়, মুখে। দক্ষিণা বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। মধুপানে পরিতৃপ্ত মৌমাছিরা গুনগুন করে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে।

খেলোয়াড়দের মধ্যে একজনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই একটু চমকে ওঠে কৃষ্ণ। কে এই ছেলেটি? ওর চালচলন যেন একটু কেমন কেমন। ওর চলার ভঙ্গিতে কেমন যেন এক বন্যতা।

সন্দেহটা মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে কৃষ্ণের। কে এই রাখাল বালক? কেন ওর এমন ভাবভঙ্গি?

খেলার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকলেও মনটা কিন্তু মাঝে মাঝে খচখচ করতে থাকে কৃষ্ণের। ছেলেটির পরিচয় তাকে জানতেই হবে, কিন্তু কোন্ উপায়ে?

সঙ্গী সাথীদের মধ্যে দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করেও কোন সঠিক জবাব পাওয়া গেল না। আবার ছেলেটিকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করাও চলে না, মনে দুঃখ পেতে পারে।

খেলা চলছিল দু'দলের মধ্যে। একদলের অধিনায়ক বলরাম, আর অন্যদলের স্বয়ং কৃষ্ণ। কথা ছিল, যে দল খেলায় হেরে যাবে তাদের প্রত্যেককে বিজয়ী দলের এক একজন খেলোয়াড়কে পিঠে চাপিয়ে দূরের বড় অশ্বত্থ গাছটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

দু'দলের মধ্যে জোর খেলা চলছিল, সেই রাখাল বালকটি ছিল কৃষ্ণের নিজেরই দলে। প্রাণপাত পরিশ্রম করে দু'দলের খেলোয়াড়েরা খেলছিল, জিততে হবেই। নইলে অতদূরে ওদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে হবে এক ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ।

খেলতে খেলতে কৃষ্ণ মাঝে মাঝে আড়চোখে লক্ষ্য করছিল সেই রাখাল বালকটিকে। অদ্ভুত গায়ের জোর ছেলেটার, ক্লান্তি নেই এতটুকু।

এত করেও কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হেরে গেল কৃষ্ণের দল। হৈ-হৈ শব্দে হর্ষধ্বনি

করে উঠলো বলরামের বিজয়ী দল। এবার শাস্তির পালা। একে একে ওদের প্রত্যেককে বয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই অশ্বত্থ গাছের কাছে।

বিজয়ী দলের মধ্যে বলরামই দেখতে শুনতে বেশ বড়সড়। দেহের ভারও তারই বেশী। কাজেই মুশকিল বাধলো তাকে নিয়েই। বলরামের ভার বইতে কেউই রাজী হয় না। অবশেষে অনন্যোপায় কৃষ্ণ নিজেই এগিয়ে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই রাখাল ছেলেটি দু'পা এগিয়ে এসে সারা মুখে বন্য হাসি ফুটিয়ে তুলে বলে ওঠে, না সখা, তা কি হয়? আমরা থাকতে তুমি এই গুরুভার বইবে কেন? আমিই ওকে নিয়ে যাবো।

ছেলেটির কথায় দলের সকলেই প্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। কৃষ্ণের নিজেরও খুশী হবার কথা। কিন্তু কেন যেন সে খুশী হতে পারে না। সন্দেহমাখা দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সে কেবল সম্মতি জানায়।

রাখাল ছেলেটি বলরামের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর চোখের পলকে অদ্ভুত কৌশলে বলরামকে তুলে নেয় নিজের পিঠের উপর।

অতবড় ভারী বোঝা নিয়ে অনায়াসেই হেঁটে চলেছে সেই রাখাল বালকটি। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দ্রুত পায়ে সে হেঁটে চলেছে সেই গাছের দিকে।

কিন্তু ওকি? সেই বড় অশ্বত্থ গাছটি ছাড়িয়ে ছেলেটা কোথায় চলেছে? তবে কি ও ভুল করেছে নাকি? কিন্তু কী আশ্চর্য, ছেলেটা একটু একটু করে লম্বা হচ্ছে কেন?

ব্যাপারটা চোখে পড়তেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণ। তার সন্দেহ অমূলক নয়। ছদ্মবেশে কোন দানব ভিড়ে পড়েছিল তাদের দলে। এখন একটু একটু করে নিজের মূর্তি ধরে পালিয়ে যাচ্ছে বলরামকে নিয়ে।

দানব প্রলম্বাসুরের কাঁধে বসে থেকে বলরাম যখন ব্যাপারটা টের পেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দানব প্রলম্বাসুর ততক্ষণে তার তালগাছের মত লম্বা দেহটা নিয়ে দৌড়ে চলেছে, কাঁধের উপর বলরাম। অত উঁচু থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তেও সাহস হচ্ছিল না বলরামের। উঁচুনীচু পথের পাশে বড় বড় পাথরের টুকরো। কাজেই বাধ্য হয়ে প্রলম্বাসুরের চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে শক্ত হয়ে বসেছিল নিরুপায় ভঙ্গিতে।

এদিকে রাখাল বালকদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ তাড়া করে চলেছে সেই দানবকে। মাঝে মাঝে পেছন থেকে পাথর ছুঁড়ছে তার দিকে। কিন্তু ঐ সামান্য পাথরের আঘাতে তার কী হবে?

প্রলম্বাসুর যেই মুহূর্তে বুঝতে পারলো যে তার কাঁধের উপর থেকে বলরামের পালাবার কোন সম্ভাবনা নেই, উলটে বলরামই পড়ে যাবার ভয়ে শক্ত হাতে তার চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে আছে, সেই মুহূর্তে মনে মনে একটু হাসলো সে। এবার লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা কংসের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হবে কাঁধের ঐ ছেলেটাকে নিয়ে।

কিন্তু ওকি, হঠাৎ কাঁধটা এমন হালকা হয়ে গেল কেন? দাঁড়িয়ে পড়ে দানব প্রলম্বাসুর। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই একটা বিরাট উঁচু দেবদারু গাছকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দু'পা দিয়ে দানবের মাথায় আঘাত করে বলরাম।

এমন আচমকা আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না প্রলম্বাসুর। হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে নীচে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বলরাম তার মাংসল দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে তার টুঁটি চেপে ধরে।

কিন্তু ভয়ংকর দানব প্রলম্বাসুরের সঙ্গে বালক বলরাম এঁটে উঠতে পারবে কেন? চোখের পলকে প্রলম্বাসুর তার শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বলরামকে। ব্যথায় নীল হয়ে ওঠে বলরামের ফরসা মুখখানা। হয়ত এখনই তাকে পিঁপড়ের মত টিপে মেরে ফেলবে ঐ দানব।

চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে বসেছিল নিরুপায় ভঙ্গিতে। [পৃষ্ঠা ৩৮০

কিন্তু না, তা আর হলো না। প্রলম্বাসুর আর পেল না সেই সুযোগ। তার আগেই তার বুকের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষ্ণ।

উঃ, কী ভীষণ ভারী! সামান্য একটা বালকের দেহ যে এমন ভারী হতে পারে তা ছিল তার কল্পনারও অতীত। একখানা বিরাট জগদ্দল পাথরে যেন চাপা পড়েছে দানব প্রলম্বাসুর। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, থরথর করে কেঁপে উঠছে তার বিরাট দেহটা। প্রাণপণ শক্তিতে পাশ ফিরতে চেষ্টা করে প্রলম্বাসুর। কিন্তু সামান্য একটু নড়তে পর্যন্ত পারছে না সে।

গলগল করে মুখের কষ বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে সেই দানবের। আলগা হয় তার হাতের শক্ত মুঠি। মুক্ত হয় বলরাম, আর পরমুহূর্তেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে যায় প্রলম্বাসুরের ভয়ংকর দেহটা।

দানব প্রলম্বাসুরের মৃতদেহটাকে ঘিরে দাঁড়ায় রাখাল বালকেরা। দানবের রোমশ বুকের উপর পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে দুই ভাই—কৃষ্ণ ও বলরাম।

নতুন ধাঁধা

১। সবটা খেতে কষ্ট লাগে
ভুল নেইকো কোন,
খানিক খেতে মিষ্টি বড়
আজব কথা শোন।

২। মাথায় দিয়ে পা
যেথা যাচ্ছিস যা।
ডালের সঙ্গে আছিস জুড়ে;
যাত্রাগান গা।

—কল্পনা দাস ও সুখেন্দু দাস, নবপল্লী, কলিকাতা।

৩। বাসা বেঁধে আছে তা
মিষ্টিটা খেয়ে যা।

—পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা, ছড়রা, পুরুলিয়া।

গত বৈশাখ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। তেজপাতা ২। মাখন ৩। কপোত

গত বৈশাখ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—রীণা চট্টোপাধ্যায়—ভালতলা এভেনিউ; বিশ্বনন্দন, কবিতা, ডল ও স্মৃতিদাস—গর্চা ফার্স্ট লেন; পিকলু, টুবলু, তোতন ও টুলটুল—পূর্ণ মিত্র লেন; শ্রীমন্ত মুখার্জী—টালিগঞ্জ; সন্দীপ, পরেশ, সন্তোষ, অমল ও দেবাশিষ—জামির লেন; মায়া, কেয়া, গদাই ও ঝুমনি দি—কাশীমিত্র ঘাট; সমীরণ, অমল ও সঙ্গীতা রায়—গর্চা ফার্স্ট লেন; বাবলু, মিঠু, মামণি ও রাজু—প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড।

২৪ পরগনা—রাঙ্কা, মিতা, পল্লব, হেনা, বাপী ও মাও মাও সরকার—বারাকপুর; মিতা, টুমপা, দিদি, দাদা, পার্থদা, বউঠান ও শিবুদা—বারাসাত; সৌমিত্র-শঙ্কর ও সুশান্তশঙ্কর উকিল—বারাকপুর; বাবা, মা, কাকু, ঝন্টু ও পুতুল—ডমডম হারবার; হিমাদ্রি, নীলাদ্রি, বৈশাখী, রিন্টু, লিটল ও ডল—বিরাটী; দেবাশীষ, স্নেহাশীষ, নিবেদিতা ও জ্যোঠু—কাঁচড়াপাড়া; আবীর, অভিজিৎ, কেয়া, কাজল, তাপস, চন্দন ও মা—বারাকপুর।

হাওড়া—বাপ্পা, রাণা, লালী, খোকন, মামা, মামীমা

ও দিদিমা—হাওড়া-১ ; সরোজ, মনোজ, পঙ্কজ, কৃষ্ণা কাবেরী ও শবরী বন্দ্যোপাধ্যায়—নোন ; মৌসুমী ও অমু ম পাল—নেতাজী সুভাষ রোড ; অতনু দাস—সালকিয়া ; খোকা, সুশান্ত, মিঠু, নির্মলা ও প্রতিমা—কাসুন্দিয়া রোড ; পিকু, কুমার, ক্ষমাদাস, বাবু ও মা—বি ই. কলেজ ; বিমান, রবীন, কমল, মীরা, তৈতালী ও রীতা—শিবপুর।

হুগলী—পুপাই, ভাইটি ও বাবুসোনা—বৈদ্যবাটী ; পিকু, অলকা, যুথিকা ও অশোককুমার দত্ত—বাঁশবেড়িয়া।

বর্ধমান—খুকু মিঠু, বেয়া, রবি, বিকাশ, বিশ্বেশ্বর ও জয়দেব—বীরহাটা ; সন্দীপন, উদয়ন ও সিদ্ধার্থ—আসানসোল ; অনুপ ও জলি পালিত—বার্নপুর ; ঝর্না, দীপু, দেবু প্রভৃতি—কুলটী।

বাঁকুড়া—বাপী, মণি, টুটুল ও সচ্চিদানন্দ রায়—খাতরা ; স্বপ্না, অঞ্জন, সঞ্জয়, মা, বাবা, অরুণকাকু প্রভৃতি—সাবড়াকোন।

পুরুলিয়া—গৌতম, সোমা, রুমা, শিবাণী ও মুন—আদ্রা ; কাজল, কল্যাণ, কবিতা, কণিকা, কল্লোল, মা ও বাবা—আদরা ; পার্থ, মিলু, চন্দন, শ্রীমন্ত প্রভৃতি—আদরা ; ত্রিদিব, বাসবী, সোমা, প্রদীপ, আলোক ও অরুণ—পাড়া ; শশাঙ্ক, সন্ধ্যা, শান্তি, মুনীবালা ও সুদর্শন—কুমারডুবি।

বীরভূম—সুব্রত, সুমিতা, সুতপা ও সুমনা হাজরা—আহমদপুর।

মালদহ—মোহন ও বুলবুল সান্যাল—ঝনঝনিয়া।

বিহার—ঠাকুরমা, পুতুল, অরূপ, অনুপ, অলক ও বুজন—লোদনা ; বাবা, মা, প্রশান্ত, কল্যাণী ও পার্থ—মাইথন-রাঁচী কলোনী ; সঞ্চিতা মল্লিক—বেগুসরাই ; নিশীথ, অসিত, তড়িৎ, অমিত, বাবা ও মা—ঘাটশীলা ; রুবেন, বনশ্রী ও তনুশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর ; উজ্জ্বল ও কুশল চৌধুরী—বোকারো।

মধ্যপ্রদেশ—গোপাল, খোকন, বীণা ও খোকা—বিলাসপুর।

আসাম—জীষ্ণু, প্রণয়, পুলিন, সুজিতদা ও নিকা—উলুবাড়ি ; অতনু, বিনি, শান্তনু, মণি, খুকু, বেবী ও ছোড়দা—চাঁদখিরা চা বাগান ; দেবযানী, কাজলী ও শঙ্কর বাগ—গৌহাটি-১১ ; কাকু, বাবি, শৈবাল ও প্রবাল মিত্র—গৌহাটি-১১।

দিল্লী—অমিতজ্যোতি সেনগুপ্ত—মরিসনগর।

কে আমেরিকা আবিষ্কার করে ?

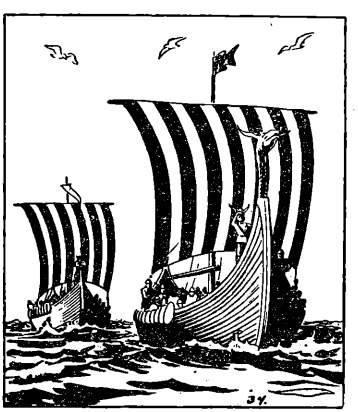

ছবিটা দেখলে মনে নৌকাটি যেন গাধা বোটের মত দেখতে। কিন্তু এগুলি পুরাকালের জাহাজ। নরওয়ে ও সুইডেনের ভাইকিংরা এই জাহাজে চড়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার ৫০০ বছর আগে উত্তর আমেরিকায় অবতরণ করেছিল। কথিত আছে নর্সম্যান এরিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীনল্যাণ্ডে পৌঁছয়। কানাডার পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রীনল্যাণ্ড থেকে মাত্র ৭৩৬ মাইল দূরে। এই দীর্ঘ জলপথ এই জাহাজগুলি বিনাপ্রতিরোধে অতিক্রম করেছে। জাহাজগুলি ছিল লম্বায় ৭৫ ফুট, চওড়ায় ২৫ ফুট।

বলুন তো এদের মধ্যে কার মা খেতে দেন ইনক্রিমিন*?

ঠিক ধরেছেন!

ড্রপ্স—২ মাস থেকে
২ বছরের শিশুদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর অবধি
বয়েসের বাচ্চাদের জন্যে

বড়ো হওয়ার বড়ো সহায়!
এই তো বাড়ন্ত বয়েসের
ছেলেমেয়েদের জন্যে সেরা টনিক!

ইনক্রিমিন* টনিক

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে।

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle

সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ

* আমেরিকান সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

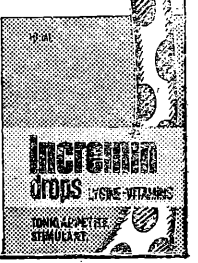

SISTA'S-INC-1095 BEN

HM 5596B

রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলে— স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

মাঠে রাজু খুবই চটপটে আর পরিশ্রমী। আর সেটা বজায় রাখতে ওর মা রোজ ওকে খেতে দেন **হরলিক্স**। যা খেলে শরীরে বল হয়, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে আর আসে বাড়তি শক্তি।

সুচিত্রা দেবীর মত দুনিয়ার সব মায়েরাই **হরলিক্সের** ওপর বিশ্বাস রাখেন আর আজ প্রায় ১০০ বছর ধরে ডাক্তাররাও এটি খেতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

“**হরলিক্সে** পুষ্টিকর খাদ্যগুণ রয়েছে যা স্বাস্থ্য ভাল রাখতে খুবই সাহায্য করে। তাছাড়া, **হরলিক্স** হজম করাও খুব সহজ। আমার পরিচিত সুস্থসবল পরিবারের সকলে রোজ **হরলিক্স** খান।”

হরলিক্স রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

‘হরলিক্স’—
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

আপনাদের চাহিদাতেই
এর জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে
লিপটনের রুবি ডাস্ট
RUBY
DUST
প্রতি প্যাকেটে পাবেন
ঢের বেশি কাপ চা
তাই এর কদর
দিন দিন বেড়েই চলেছে
একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর
লিপটন
বলতেই
ভালো চা
LIPTON

ক্যালকাটা প্রোডাকসন্সের ছবি · পরিচালনা · উমাপ্রসাদ মৈত্র · সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত
বর্ণালী ফিল্মসের
এক যে ছিল
বাঘ
লক্ষ্মী-সোনা বাঘ এর নেই একদম রাগ

কোলে
থিন এরারুট

ISI

"সকলকে খাইয়েও তৃপ্তি"—মা

কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১০

PPS-KB-8/66B

সর্বজন প্রশংসিত এবং বহুল প্রচারিত

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য ২৫·০০

ডাকমাসুল সহ টা. ৩০·০০ স্থলে টা. ২৫·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 12·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs, 12·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৫·০০ স্থলে মাত্র টা. ১২·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 6·50

Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 6·50

ডাকমাসুল সহ টা. ৮·০০ স্থলে মাত্র টা. ৭·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

এবার পূজায়
দেব সাহিত্য কুটীরের
ছোটদের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপহার

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ

বিশ্বের নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য এটি এক অসাধারণ বই। এই বই পড়ে বহু অজানাকে জানা যাবে, এর পাতায় পাতায় বিচিত্র ছবি কত না দেখা জিনিসকে চোখের সামনে তুলে ধরবে! ছবিতে ভরপুর প্লায় ১০০০ পৃষ্ঠার বইটি না দেখলে না পড়লে বোঝাই যাবেনা কি বিচিত্র এই বই। কত সুন্দর, কত জ্ঞানের ভান্ডার এই বই।

২৫·০০ টাকা পাঠালে রেজেষ্টারী করে পাঠান হয়

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা - ৯

Regd. No. C. 3063 "Suktara"

তপোবন

এবার পূজায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত

পূজাবার্ষিকীর নাম **তপোবন**

তপোবন-এ ছেলেমেয়েদের মন-ভোলান লেখা এবার লিখবেন এদেশের সমস্ত বিখ্যাত সাহিত্যিকরা।. তাছাড়া থাকবে ছবিতে গল্প. কার্টুন এবং অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি।

মূল্য ৮·০০ টাকা

অনামিকা

মধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত **অনামিকা**

নাম অনামিকা হলেও বহু নামী লেখকের লেখায় ভরা এই বই ছেলেদের মন ভোলাবে। মূল্য ৫·০০ টাকা

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের

গল্প বলি শোন

শোনবার মত গল্প করে বলতে জানেন এই লেখক। কখনও পথ চলতে চলতে, কখনও রূপকথা রাজ্যের মনমাতানো কাহিনী লেখকের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে। এই সব গল্পে ভরা এই বই পূজার এক নতুন উপহার। মূল্য ৫·০০ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

রোমাঞ্চকর চিত্রকাহিনী

শুধু ছবি আর ছবি। সিনেমার কাহিনীর মত করে আঁকা অসংখ্য ছবির মধ্যে দিয়ে নানা দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর গল্প বলা হয়েছে। মূল্য ৫·০০ টাকা

ছোটদের বুক অব নলেজ

বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশ করেছে ছেলেদের জন্য বুক অব নলেজ। যা সত্য তাই বিস্ময়কর। বুক অব নলেজ দেখলেই তা বোঝা যায়। মূল্য ২৫.০০ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-৯